প্রথম অধ্যায়
আহলে বাইত-এ-রাসূল (সা.) এবং সাহাবা একটি পর্যালোচনা

সৃষ্টির আদিতে আহলে বাইত (আ.)

রাসূল (সা.) বলেছেন- যখন আল্লাহ্পাক আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করলেন, তাঁর দেহে রুহ প্রবেশ করালেন, আদম (আ.) আশ্চর্যান্বিত হয়ে দর্শন করলেন- পাঁচটি পবিত্র মুখমন্ডল যাঁরা আল্লাহ্র দরবারে সেজদাবনত অবস্থায় রয়েছেন। আদম (আ.) নিবেদন করলেন প্রভু, এঁরা কারা, যাঁদের মুখাবয়ব আমারই মত দর্শন করছি।

আল্লাহ্ ফরমাইলেন- এই পাঞ্জাতন পাক তোমারই বংশ হতে আগমন করবেন, কিন্তু এরা তোমার সৃষ্টি হতে উদ্ভূত হবেন না; বরং তারা আল্লাহ্র নূর হতে উদ্ভুত হবেন। আমি সমগ্র সৃষ্টিকে রূপ দিয়েছি এদেরই কারণে আর তাঁদের নামকরণ করা হয়েছে আমারই নাম হতে।

আমি মাহমুদ	মুহাম্মদ
আমি আলা	আলী
আমি ফাতির	ফাতিমা
আমি এহসান	হাসান
আমি মুহসিন	হুসাইন

আমি আমার ইজ্জতের কসম করে বলছি যে, যদি কেহ এদের জন্য সামান্যতম অসম্মান, ঘৃণা, হিংসা নিয়ে আসে তবে নিশ্চয়ই তাকে আমি দোজখে নিক্ষেপ করব। জেনে রাখ হে আদম, এই আহলে বাইত, আমার মনোনীত, পছন্দকৃত, নির্বাচিত, নেয়ামতপ্রাপ্ত এবং তাঁদের জন্যই আমি ক্ষমা করব, পৃথিবীবাসীর অগণিত জনকে। যদি তুমি বা তোমার বংশে কেহ দুঃখ, কষ্টে মুসিবতে পড়ে যেন আমাকে এদের মাধ্যমে ওসিলার সন্ধান করে? রাসূল (সা.) আরও ফরমাইয়াছেন যে, কেহ নিরাপত্তা চায়, তাহলে বন্ধুত্ব স্থাপন করুক আমাদের পাক পাঞ্জাতনের নামে। [লেখক- নজির আহম্মদ, প্রকাশক- শেখ মহসীন আলী, লাহোর, পৃষ্ঠা-৪৫; আলে রাসূল ও মুয়াবিয়া, লেখক- মনজুর আলম কাদেরী]

পাক-পাঞ্জাতনের উসিলায় হযরত আদম (আ.)-এর গুণাহ্ মাফ তথা দোয়া কবুল

এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে যে-"অত:পর আদম তাহার প্রতিপালকের নিকট হঠাৎ কিছু বাণী (কলেমা) প্রাপ্ত হইলেন। আল্লাহ্ তাহার প্রতি ক্ষমাপরবশ হইলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু" [সূরা ০২ বাকারা, আয়াত-৩৭]।

আল্লাহ্র নিকট থেকে হযরত আদম (আ.) যে বাণীপ্রাপ্ত হলেন সেই নামসমূহের উসীলায় হযরত আদম (আ.)-এর দোয়া কবুল করেন। এরা হলেন মহান আহলে বাইত-হযরত মুহাম্মদ (সা.), ইমাম আলী, হযরত মা ফাতিমাতুজ যাহরা, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (আ.)।

হৃদয় তীর্থ মদীনার পথে, লেখক- মুহীউদ্দিন খান, পৃষ্ঠা১৫৬; তফসীরে দূররে মানসুর, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬১; ইয়ানাবিউল মুয়াদাত, লেখক-সোলায়মান কান্দুজী, খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩২]।

পবিত্র কোরআনে আহলে বাইত

'আহলে বাইত' বা নবী বংশের প্রতি আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য পবিত্র কোরআনে চারটি পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েছে- জুররিয়া, আল, আহল ও কুরবা।

'জুররিয়া' শব্দটির অর্থ হচ্ছে সন্তান-সন্ততি, প্রত্যক্ষ বংশধর যা কোরআনে বত্রিশটি আয়াতে উল্লেখ আছে। এটা ব্যবহৃত হয় নবীদের আপন উদ্বেগ সম্পর্কে যে তাঁদের সন্তানেরা যেন তাদের পথে অবিচল থাকে কিংবা আল্লাহ্র

পক্ষ থেকে হেদায়েতের কাজ যেন সরাসরি তাদের সন্তানদের মাধ্যমেই চলতে থাকে। আপন বংশধরদের প্রতি নবীদের এ উদ্বেগ প্রতিফলিত হয় এই আয়াতে-

"স্মরণ কর যখন ইব্রাহীমকে তাঁহার প্রতিপালক কয়েকটি বাক্য (নির্দেশ) দ্বারা এ পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং সেইগুলি সে পূর্ণ করিয়াছিল। আল্লাহ্ বলিলেন আমি তোমাকে মানব জাতির নেতা (ইমাম) করিতেছি। সে বলিল- আমার বংশধরদের মধ্য হইতেও? আল্লাহ্ বলিলেন- আমার প্রতিশ্রুতি (আশীর্বাদ-ঐশী নেতৃত্ব/ক্ষমতা) যালিমদের প্রতি প্রযোজ্য নয়।" [সূরা ০২ বাকারা, আয়াত-১২৪]

এই আয়াতের মাধ্যমে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, মানবজাতির প্রকৃত নেতা নিয়োগের জন্য সাধারণ জনগণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত নয়; বরং আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং তাঁর নির্বাচিত, মনোনীত ও নিয়োগকৃত ব্যক্তিবর্গ দিয়ে এই বিশ্ব পরিচালনা করে থাকেন। অর্থাৎ ধর্মীয় নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব একই ব্যক্তির অধীন। সংগত কারণেই রাজনীতির ও ধর্মের বর্তমান বিভাজন একটি অধর্মীয় কর্মকান্ড। তাছাড়া এই আয়াতের মাধ্যমে এটাও প্রমাণিত যে, অসৎ, ফাসেক, অন্যায়কারী, কাফের, মুনাফেক, জালেম ব্যক্তি পার্থিব নেতৃত্বের জন্য অযোগ্য।

নবীদের বংশধর বা যাঁরা খোদার বিশেষ অনুগ্রহ ও হেদায়েত লাভে নবীদের উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন সে সম্পর্কিত আয়াতে একই পিতার বংশধর একজন ব্যক্তির পরিবার বা রক্তদ্বারা সম্পর্কিত হিসাবে নিকটতম আত্মীয় অর্থে আল শব্দটি কোরআনে ছত্রিশবার ব্যবহৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন-

"অথবা আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যাহা দিয়েছেন সেজন্য কি তাহারা তাহাদিগকে ঈর্ষা করে? আমি ইব্রাহীমের বংশধরদের কেও (আলে ইব্রাহীমকেও) কিতাব ও হিকমত প্রদান করিয়াছি এবং তাহাদিগকে বিশাল রাজ্য দান করিয়াছি।" [সূরা ০৪ নিসা, আয়াত-৫৪]

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে আরো অনেক আয়াতের উল্লেখ করা আছে। আল্লাহ্পাক বলেন-

"নিশ্চয় আল্লাহ্ আদম, নূহ, ইব্রাহীমের পরিবার ও ইমরানের পরিবারকে সমস্ত মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। বংশানুক্রমে এরা পরস্পরের বংশধর। আর আল্লাহ্ সব শোনেন, সব জানেন।" [সূরা ০৩ আলে ইমরান, আয়াত-৩৩]।

'আহল' শব্দটি যা কোরআনে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে, তা প্রায় 'আল' শব্দটিরই সমার্থবোধক। যখন এটি 'বাইত' শব্দটির সাথে সংযোজক অব্যয় হিসাবে ব্যবহৃত হয় তখন এর অর্থ দাঁড়ায় একই পরিবারের নিকটতম বংশধর অথবা একই ব্যক্তির পরিবার। আহলে বাইত এই সংযোজিত শব্দটি কোরআনে বিশেষভাবে মুহাম্মদ (দ.) এর সরাসরি পরিবার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র কোরআনে বলা হচ্ছে-

"হে নবী-পরিবার। আল্লাহ্ তো কেবল চাহেন তোমাদিগের নিকট হইতে অপবিত্রতা দুর করতে এবং তোমাদিগকে সম্পূণরূপে পবিত্র করতে।" [সূরা ৩৩ আহযাব, আয়াত-৩৩]

কোরআনের তাফসীরকারকদের সর্বসম্মত মতানুযায়ী এই আয়াতে আহলে বাইত বলতে মুহাম্মদ (দ.)-এর কন্যা ফাতিমা, তাঁর চাচাতো ভাই ও জামাতা আলী ও এবং তাঁদের দুই পুত্র হাসান ও হোসাইন ও তৎপরবর্তী বংশধরকে বুঝানো হয়েছে।

চতুর্থ পরিভাষা 'কুরবা'। মূল শব্দ 'করুবা, যার অর্থ নৈকট্য, অর্থাৎ নিকট বা রক্তের দ্বারা সম্পর্কিত আত্মীয় বা জ্ঞাতি। কুরবা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে । বিশেষভাবে মুহাম্মদ (দ.)-এর নিকটতম আত্মীয় প্রসঙ্গে। পবিত্র কোরআনে বলা হচ্ছে-

"বল, আমি ইহার (ধর্ম প্রচারের বিনিময়ে তোমাদের নিকট হইতে আত্মীয়ের সৌহার্দ (মোয়াদ্দাত-প্রাণাধিক ভালোবাসা) ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাহিনা।" [সূরা ৪২ শুরা, আয়াত-২৩]

এই আয়াতের ব্যাখ্যাতেও তাফসীরকারকগণ আবারো একমত যে, কুরবা' শব্দটি মুহাম্মদ (দ.)-এর নিকটতম আত্মীয়- আলী, ফাতিমা, হাসান ও হোসাইন (আ.) যাঁদের প্রাণাধিক ভালোবাসা উম্মতের জন্য ফরজে আইন তথা ব্যক্তিগতভাবে বাধ্যতামূলক।

নবীদের পরিবারের জন্য বিশেষ অনুগ্রহের আবেদন ও তা মনজুর হওয়া উল্লেখিত হয়েছে কোরআনে এমন আয়াতের সংখ্যা এক শতকেও ছাড়িয়ে যায়। এ থেকে আমরা দু'টি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। এক এটা তর্কাতীত যে নবী পরিবারের পবিত্রতা তথা বিশেষ মর্যাদা কিয়ামত পর্যন্ত একটি স্বীকৃত ব্যাপার। তাই নবীদের আল্লাহ্ প্রদত্ত যে দায়িত্ব মানুষের আত্মিক পরিশুদ্ধকরণ নবীদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হিসাবে তাদেরকে যে

পবিত্রতা দান করা হয়েছে এই ক্ষমতা বলে তাঁরা অন্য সাধারণ লোককে পরিশুদ্ধ করতে পারেন। এই ধরনের সনদ ছাড়া কোন ব্যক্তি মানুষের আত্মিক পবিত্রতা প্রদানে সক্ষম নয়। দুই আহলে বাইত সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে ক্রমাগত পুণর্ব্যক্তকরণের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে আবশ্যিকভাবে ও সঠিকভাবেই এই ধারণার সৃষ্টি করা হয়েছে যে, রাসূল (সা.) এর পর এরাই ইসলাম ধর্মের প্রকৃত সংরক্ষণকারী নেতা: এবং তাঁদেরই মাধ্যমে এ হেদায়েতের কার্যক্রম কেয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। এই পাঁচজনই যে ইসলাম ধর্মের ভিত্তি তার বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায় যখন খ্রিস্টানদের সাথে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশে এদেরকেই সঙ্গে নিয়ে যান। এ প্রসঙ্গে কোরআনে উল্লেখ আছে-

"তোমার নিকট জ্ঞান আসবার পর যে কেহ এই বিষয়ে তোমার সহিত তর্ক করে তাহাকে বল- আইস, আমরা আহবান করি আমাদের পুত্রগণকে ও তোমাদের পুত্রগণকে আমাদের নারীগণকে ও তোমাদের নারীগণকে আমাদের নিজদিগকে (নফস তথা নবীর নফস হিসাবে আলী) ও তোমাদের নিজদিগকে, অত:পর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর দেই আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।" [সূরা ০৩ আল ইমরান, আ-৬১]।

রাসূল (সা.) হযরত ঈসা (আ.) সম্বন্ধে নাজরানের খ্রিস্টানদের অনেক বুঝালেন যে, তাঁকে যেন আল্লাহ্‌র পুত্র না বলে, তিনি হযরত আদম (আ.)-এর উদাহরণ দিলেন। কিন্তু তারা কোন কথাই শুনল না। অবশেষে তিনি আল্লাহ্‌র আদেশে পরস্পরের বিরুদ্ধে দোয়া ও মিথ্যাবাদীদের উপর অভিশাপ বর্ষণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, যাকে 'মুবাহিলা' বলে। স্থির করা হলো যে, নির্দিষ্ট সময়ে উভয় দল নিজ নিজ পুত্রদের, নারীদের, কন্যাদের এবং তাদের নিজেদের সত্তা বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে একত্র হবে এবং প্রত্যেকে অপরের প্রতি অভিসম্পাত ও আল্লাহ্‌র শাস্তি কামনা করবে। মুবাহিলার দিন সাহাবীরা সুসজ্জিত হয়ে রাসূলের (সা.)-এর গৃহের সামনে জমা হলেন, হয়তো রাসূল (সা.) তাদের সাথে নেবেন। কিন্তু তিনি প্রত্যুষে হযরত সালমান ফারসী (রা.)-কে একটি লাল কম্বল ও কাঠের খুঁটি দিয়ে সেই ময়দানে একটি ছোট সামিয়ানা টাঙ্গাতে পাঠিয়ে দিলেন। রাসূল (সা.) ইমাম হুসাইনকে কোলে নিয়ে ইমাম হাসানের হাত ধরলেন এবং মা ফাতিমাকে (আ.) নিজের পিছনে আর হযরত আলীকে তাঁর পেছনে রাখলেন। অর্থাৎ সন্তানদের স্থানে তিনি নাতিদের, নারীদের স্থানে নিজ কন্যাকে এবং নিজ 'সত্তা' বলে গণ্যদের স্থানে হযরত আলীকে নিলেন এবং দোয়া করলেন "হে আল্লাহ্‌ প্রত্যেক নবীর আহলে বাইত থাকে! আমার আহলে বাইত হচ্ছে এরা। এদের সকল দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত ও পাক পবিত্র রেখো।" বস্তুত তিনি এরূপ ভঙ্গীতে ময়দানে পৌঁছালে খ্রিস্টানদের নেতা আকব তা দেখে বলল, "আল্লাহ্‌র কসম, আমি যে নূরানী চেহারা দেখছি যদি এরা পাহাড়কে নিজ স্থান হতে সরে যেতে বলেন, তবে তা অবশ্যই সরে যাবে। সুতরাং মুবাহিলা হতে হাত গুটিয়ে নেয়া কল্যাণকর। অন্যথায় কিয়ামত অবধি-খ্রিস্টানদের কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।"

পরিশেষে তারা জিযিয়া কর দিতে সম্মত হল। তখন মহানবী (সা.) বলেন, "আল্লাহ্‌র কসম! এরা যদি মুবাহিলা করত আল্লাহ্‌ তাদের বানর ও শূকরে রূপান্তরিত করে দিতেন এবং ময়দান আগুনে পরিণত হয়ে যেত আর নাজরানের একটি প্রাণীও, এমন কি পাখি পর্যন্ত রক্ষা পেতো না।" এটা হযরত আলীর সর্বোচ্চ ফযিলত যে, তিনি আল্লাহ্‌র আদেশে রাসূল (সা.)-এর নফস (অনুরূপ) সত্তা সাব্যস্ত হলেন ফলে আলী সমস্ত সাহাবা থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং নবীর প্রকৃত উত্তরাধিকারী হিসেবে গণ্য হলেন। [তাফসীরে জালালাইন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬০; বায়হাকী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১১৮; তাফসীরে দুররে মানসুর, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৯ মিশর মুদ্রণ]

"মহামহিম আল্লাহ্‌ বলেন, নিশ্চয় তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একটি নুর এসেছে এবং সৃষ্ট কিতাব, আল্লাহ্‌ তা দ্বারা সরল পথ প্রদর্শন করেন তাকেই, যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি মোতাবেক চলে নিরাপত্তার পথে এবং তাদেরকে অন্ধকার রাশি থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান স্বীয় নির্দেশে এবং তাদেরকে সোজা পথ দেখান। [সুরা ০৫ মাইদাহ, আয়াত ১৫-১৬]

এ প্রসঙ্গে মোল্লা আলী কারী শরহে শেফায় লিখেছেন- "নূর ও সুস্পষ্ট কিতাব উভয়টি দ্বারা রাসূল (সা.)-এর কথা বুঝানো হয়েছে। রাসূল (সা.) হলেন গুণাবলী, সত্তা, বিধান ও সংবাদসমূহের প্রকাশ ও বিকাশস্থল। এ কারণে এটা অব্যয় পদ দ্বারা সংযোজিত পরবর্তী শব্দটি পূর্ববর্তী শব্দটির তাফসীর বা ব্যাখ্যাকারীও হতে পারে। রাসূল (সা.) নূর এভাবে যে, তিনি প্রথমে আল্লাহ্‌র মহান সত্তা থেকে ফয়েজপ্রাপ্ত হন এবং তার মাধ্যমে অন্যান্য লোকেরা ফয়েজ লাভ করে থাকে। এ কথাও প্রতিভাত হয় যে, কেউ নূরে মোহাম্মদীকে নেভাতে পারে না। এর

মাধ্যমেই এটাও বোঝা গেল যে, রাসূল (সা.)-কে বাদ দিয়ে কোরআন বুঝা সম্ভব নয়। কারণ আলো ব্যতীত কোন কিতাব পড়া সম্ভব নয়। আরো জানা গেল যে, আল্লাহ্ যাকে হেদায়েত দান করেন তা রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমেই করবেন। কেউ হুজুর (সা.)-এর অমুখাপেক্ষী থাকতে পারে না। এ প্রসঙ্গে আরো জানা যায় যে- 'জুলমত বা অন্ধকার তথা কুফরী অগণিত কিন্তু' ঈমান নূর এক বা একক। ঈমানের জন্য জরুরি হচ্ছে কুফরী থেকে বেঁচে থাকা। ঈমান ও কুফর একস্থানে একত্রিত হতে পারে না। কেননা, মহান রব 'ঈমানকে 'আলো' আর কুফরকে আঁধার' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ দুটি যেমন একে অপরের বিপরীত। তেমনি ঈমান ও কুফর। সুতরাং মুমিন ও কাফিরের মধ্যে ঐক্য সম্ভব নয়। এই মূলসূত্রের ধারাবাহিকতায় রাসূল (সা.) বলেন-

"হে মানব মণ্ডলী! আমি তোমাদের নিকট যাহা রাখিয়া যাইতেছি তাহা যদি আঁকড়াইয়া থাক তবে পথভ্রষ্ট হইবে না। প্রথমটি আল্লাহ্র কিতাব দ্বিতীয়টি আমার আহলে বাইত।'

"তোমাদের মধ্যে আমার আহলে বাইত নূহ (আ.)-এর কিস্তি স্বরূপ। যে ব্যক্তি উক্ত কিস্তিতে আরোহন করবে সেই মুক্তি পাবে। যে ইহার বরখেলাপ করবে সেই ধ্বংস হবে।"

নামাজে মহান আইলে বাইতকে সালাম ও দোয়া না করা হলে নামাজ পূর্ণ হয় না, তাই তা কবুল হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

[আরো বিস্তারিত দেখুন সহীহ মুসলিম, ইসলমিক ফাউন্ডেশন, খণ্ড-৭, হাদিস নং-৬০৪৩; সহীহ্ তিরমিযী, ইসলমিক ফাউন্ডেশন, খণ্ড-৬, হাদিস নং-৩৮৭১ ও ৩৭৮৭; তাফসীরে মারেফুল কোরআন, ইসলমিক ফাউন্ডেশন, খণ্ড-৭, পৃ-১৩২; তাফসীরে মাদানী, মুফতি মো: শকি, আহলে হাদিস লাইব্রেরী, খণ্ড-৮, পৃ-১৩-১৫; তাফসীরে মাজহারী, ইসলমিক ফাউন্ডেশন, খণ্ড-১০, পৃ-৩৩ ও ৩৪; সহীহ্ তিরমিজী, ইসলমিক সেন্টার, খণ্ড-৫, হাদিস নং-৩১৪৩ ও ৩১৪৪; খণ্ড-৬, হদিস নং-৩৭২৫, ৩৮০৮; মেশকাত শরীফ, এমদাদীয়া, খণ্ড-১১, হাদিস নং-৫৮৭৬; শেখ আব্দুর রহিম হাবলী, বাংলা একাডেমী, খণ্ড-১, পৃ-৩০৮; মাদারেজুন নবুয়াত, শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী, বউ-৩ পৃ-১১৬; তাফসীরে দূরে মানসুর, (মিসর প্রিন্ট), খণ্ড-৫, পৃ-১৯০; তাফসীরে ইবনে কাসির, মিসর প্রিন্ট) খণ্ড-৩, পৃ-৪৮৪; তাফসীরে কাশশাফ, (মিসর প্রিন্ট), খণ্ড-১, পৃ-১৯৭; তাফসীরে তুবি, মিসর প্রিন্ট), খণ্ড-১৪, পৃ১৮২; তাফসীরে এতকান, (মিসর প্রিন্ট), খণ্ড-৪, পৃ-২৪০; তীরে কবীর, (মিসর প্রিন্ট), খণ্ড-২, পৃ-৭০০; তাফসীরে সালাবি, (মিসর প্রিন্ট), খণ্ড-৩, পৃ-২২৮; তাফসীরে তাবারী, (মিসর প্রিন্ট), খন্ড২২, পৃ-৮; ফাতহুল কাদীর সাওকানী, খণ্ড-৪, পৃ-২৭৯; উসদুল গাবাহ, ইবনে আসির, (মিশর প্রিন্ট), খণ্ড-২, পৃ-১২; খণ্ড-৫, পৃ-৫২১; সহীহ্ তিরমিজী, (মিশর প্রিন্ট), বউ-৫, পৃ-৩; ইয়া নাবিউল মুয়াদ্দাত, পৃ-৭৪, (উর্দু), পৃ-১০৭ (ইস্তাম্বুল); মানাকিবে খাওয়ারেজমি, পৃ-২৩; সাওয়ায়েকে মুহরেকা, পৃ-১১৭; সুনানে বায়হাকী, খণ্ড-২, পৃ-১৪৯; ইমাম নাসাই, পৃ-১৪৯; মুয়াদ্দাতুল কুরবা, পৃ১০৭; আল ইসাবা, খণ্ড-২, পৃ-৫০২; তাবরানি, খণ্ড-১, পৃ-৬৫; আস সিরাতুল হালবিয়া, খণ্ড-১৩, পৃ২১২; তারিখে ইবনে আসাকির, খণ্ড-১, পৃ-১৬৫; আহকামুল কোল, ইবনুল আরাবি, খণ্ড-২, পৃ১৬৬; কানযুল উম্মাল, মুত্তাকী হিন্দি, খণ্ড-৫, পৃ-৯৬; তারিখে তাবারি, খণ্ড-৫, পৃ-৩১]।

হযরত সোলায়মান (আ.)-এর আমলে আহলে বাইতদের নাম সম্পর্কিত ঐতিহাসিক দলীল

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) চলাকালীন সময়ে ১৯১৬ সালে একদল ব্রিটিশ সৈন্য বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে কয়েক মাইল দূরে তাদের প্রতিপক্ষকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হচ্ছিল। পথিমধ্যে ওনাত্রারা নামক একটি ছোট গ্রামে একটি টিলা থেকে অন্ধকার রাত্রে একটি অলৌকিক আলোক রশ্মি দেখে সৈন্যদল থমকে দাঁড়াল এবং কিছু সংখ্যক সৈন্য ব্যাপারটি অনুধাবন করার জন্য কাছে গেল এবং তারা দেখলো ঐ আশ্চর্যজনক আলো মাটি ও পাথরের টিলার ফাটল দিয়ে বের হচ্ছে। তখন তারা সেটা খনন করে প্রায় ৪-গজ নীচে একটি রৌপ্যের ফলক আবিষ্কার করল যা থেকে ঐ আলো বের হচ্ছিল। পৌনে এক গজ লম্বা ও আধাগজ চওড়া ফলকটি যখনই তাঁরা হাতে নিল তখনই আলো বিচ্ছুরণ বন্ধ হয়ে গেল। সেটা পেয়ে সৈন্যদল খুবই আনন্দিত হলো কিন্তু আলো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় খুব দুঃখিত ও শংকিত হলো। তারা ঐ ফলকটি তাঁদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে নিয়ে গেল।

সেই ইংরেজ সেনা কর্মকর্তার নাম ছিল এ, এন, গ্রান্ডেল। তিনি টর্চ লাইটের আলোতে ফলকটি দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন। সেটার চারিদিকে অত্যন্ত মূল্যবান পাথর দিয়ে বাঁধানো ছিল এবং মাঝখানে স্বর্ণাক্ষরে অত্যন্ত

পুরাতন ভাষায় কিছু লেখা ছিল। তিনি ঐ লেখার পাঠোদ্ধার করতে পারলেন না। অবশ্য তাঁর ধারণা হলো এটা কোন সাধারণ জিনিস নয়। তিনি আরো বুঝতে পারলেন যে, এ লেখা অত্যন্ত সম্মানীয় ও গোপনীয় এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

অবশেষে বহু হাত বদলের পর সেটি তাঁদের সর্বাধিনায়ক ডি. ও. গ্লাডস্টোন এর হাতে পৌছাল। তিনি সেটা ব্রিটিশ প্রত্নতত্তবিদদের হাতে পৌছিয়ে দিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে ১৯১৮ সালে বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের প্রাচীন ভাষার পন্ডিতদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি দীর্ঘ কয়েক মাস কঠিন পরিশ্রম ও গবেষণা করে সেটার মর্মোদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এতে জানা যায় যে, উক্ত রৌপ্য ফলকটি হযরত সোলায়মান (আ.)-এর ছিল এবং সেটার লেখাগুলো প্রাচীন ইব্রানী ভাষায় যে ভাষায় যবুর কিতাব ও গজলুল গজলাত (সোলায়মান (আ.) নিকট নাযিলকৃত সহীফা) লেখা। পর্যবেক্ষণ কমিটির সদস্যগণ ফলকে লেখা হযরত আহম্মদ, এলিয়া (আলী) আল বাতুল (ফাতেমা) হাসান ও হোসাইনের নাম পড়ে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। অবশেষে ফলকটি ব্রিটেনের রাজকীয় যাদুঘরে সংরক্ষণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। কিন্তু ইংল্যান্ডের প্রধান ধর্মযাজক এই সংবাদ পাওয়ার সংগে সংগে ১ মার্চ, ১৯২০ খৃষ্টাব্দে একটি গোপনীয় আদেশ জারী করেন, তা হলো যদি এই ফলক কোন জাদুঘরে রাখা হয় অথবা এমন কোন জায়গায় যেখানে জনসাধারণ অবাধ চলাফেরা করে তবে খৃষ্টান ধর্মের ভিত অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তা চিরতরে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সুতরাং উক্ত ফলককে ইংল্যান্ডের গীর্জার একান্ত গোপনীয় কক্ষে রাখাই শ্রেয় যেখানে জনসাধারণের অবাধ একান্ত যাতায়াত নাই।

এই ফলকে ইব্রানী ভাষায় লিখিত শব্দগুলোর বাংলা অনুবাদ: আল্লাহ্, আহম্মদ। আলী, বাতুল (ফাতিমা), হাসান, হোসাইন, ইয়া আলী, আমায় সাহায্য করো, ইয়া আহমদ এসো, ইয়া বাতুল দৃষ্টি রাখ, ইয়া হাসান করুনা কর, ইয়া হোসাইন আনন্দ দান করো। আলী, আলী, আলী, এবং সোলায়মান এ পাঁচজনের ওসীলায়। আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করিতেছেন এবং আল্লাহ্র শক্তি 'আলী'।

এখন প্রশ্ন হতে পারে এই গোপন তথ্য কিভাবে জনসমক্ষে প্রকাশিত হলো এবং এ উত্তর হলো এর সাথে সংশ্লিষ্ট দুইজন কর্মকর্তা টমাস ও উইলিয়াম ১৯২৩ সালে - বিখ্যাত ইরানী আলেম হাসান মুস্তবা তেহরানীর হাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি তখন নিউ ক্যাসেলে অবস্থান করছিলেন, যিনি টমাসের নাম বদল করে ফাজীজাল হোসেইন এবং উইলিয়ামের নাম বদল করে কারাম হোসেন রাখেন। এরা দুইজন ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে পবিত্র কাবা, মদিনায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর রওজা ও কারবালায় ইমাম হোসাইন এবং নাজাফে ইমাম আলী (আ.)-এর রওজা জিয়ারত করেন। [সূত্র: From Muslim chronicle London, 3rd December 1926; Release-ALIslam, Delhi Feb: 1927] মহানবী (সা.) এর আহলে বাইত (আ.)ই নাজাতের উসিলা লেখক মোহাম্মদ নাজির হোসেন প্রকাশকাল, ১৩ জুন ২০১৪, পৃ: -৩২।

হযরত নূহ (আ.)-নৌকার ফলকে আহলে বাইতের নাম মোবারক একটি ঐতিহাসিক দলীল

১৯৫১ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে রাশিয়ার একদল গবেষক কোহেকাফ পাহাড়ের পাদদেশ পরিদর্শন করছিলেন। মাটি গবেষণা করতে গিয়ে এক জায়গায় কিছু পচা কাঠের টুকরা দেখতে পেলেন। তখন দলের অধিনায়ক অতি আগ্রহের সাথে ঐ জায়গাটি খুঁড়তে লাগলেন। মাটির নীচে অনেকগুলো সাজানো কাঠ পেয়ে অবাক হয়ে গেলেন। থরে থরে সাজানো অনেক কাঠ দেখে তারা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে জায়গাটি খুঁড়তে লাগলেন এবং প্রচুর পরিমাণে কাঠ ও অন্যান্য জিনিসপত্র পেলেন। এর মধ্যে পাঁচ কোণা বিশিষ্ট একটি ফলকও পেলেন। ১৪ বাই ১০ ইঞ্চি। চওড়া ঐ ফলকটি পেয়ে তাঁরা হতবাক ও বিস্মিত হলেন যে অন্যান্য কাঠের তুলনায় ফলকটি সম্পূর্ণ অবিকৃত ও অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। উক্ত ফলকটি সম্বন্ধে গবেষকগণ বহু গবেষণা করে তার (মর্মবাণী উদ্ধার করতে পারলেন যে, সেটা নুহ (আ.)-এর নৌকায় ফলকটি রক্ষিত ছিল এবং সেটাতে অতি প্রাচীন ভাষায় কিছু লেখা ছিল। মাটির নীচে প্রাপ্ত কাঠগুলো থেকে এটা যখন প্রমাণিত হলো যে, সেটি নূহ (আ.)-এর সেই ঐতিহাসিক নৌকার। তখন তাঁদের এটিতে লিখিত বিষয়বস্তুর পাঠোদ্ধার করার জন্য আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পেল। তখন রাশিয়ার প্রাচীন ভাষাবিদদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হলো। কমিটির সদস্যগণ ছিলেন

১. প্রফেসর সোলেনফ, মস্কো ইউনিভার্সিটি।

২. প্রফেসর ইফাহান, খেনু, লুলহান কলেজ, চীন।
৩. মিশানেনুল ফরেং, অফিসার ইনর্চাজ, কংকাল।
৪. তমলগরফ, শিক্ষক, ক্যাবজার্ড কলেজ।
৫. প্রফেসর ডিপাকান, লেনিন ইনষ্টিটিউট।
৬. এম, আহম্মদ কোলাড, জিট কোমেন, রিসার্স এশোসিয়েশন।
৭. মেজর কট লোফ, ষ্টালিন কলেজ।

কমিটি ১৯৫৩ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তাঁদের কার্যক্রম শুরু করেন। দীর্ঘ ৮ মাস নিবেদিত গবেষণা করার পর কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, ঐ ফলকটি/ হযরত নূহ (আ.) তাঁর জাহাজ তৈরীর সময় ব্যবহার করেছিলেন এবং তার জাহাজে তা সংরক্ষণ করেছিলেন। যাতে তারা আল্লাহ্‌র রহমতপ্রাপ্ত হয়ে তাদের নৌকা ও যাত্রীগণ নিরাপদে অবস্থান করতে পারেন। ইংল্যান্ডের ম্যাম ষ্টোরের প্রাচীন ভাষার গবেষক মি: এন. এফ ম্যাক্স ঐ ফলকের লেখার ইংরেজী অনুবাদ করেছেন যার বঙ্গানুবাদ-

"হে আমার প্রভু, আমার সাহায্যকারী। আমার হাত করুনা ও রহমতের সঙ্গে ধর। তোমার পাক পবিত্র প্রিয় বান্দাদের ওসিলায়। মোহাম্মদ, এলিয়া (ইমাম আলী), সাব্বার (ইমাম হাসান) সাব্বির (ইমাম হোসাইন) ফাতিমা (বাতুল)। যারা স্বয়ম্ভু ও সম্মানী বিশ্ব চরাচর তাঁদের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের নামের ওসিলায় আমাকে সাহায্য কর। সরল পথে চালাবার মালিক একমাত্র তুমি।" [সূত্রঃ Weekly Mirror-U.K 28th December 1954; Bathrah Najaf-Iraq, 2nd February 1954; AFHuda Cairo-36th March-1954; EIlia Light, Knowledge and Truth, Lahore- 10th July 1969; মহানবী (সা.)-এর আহলে বাইত (আ.)-ই নাজাতের উসিলা, লেখক- মোহাম্মদ নাজির হোসাইন, পৃষ্ঠা-৩৪, প্রকাশকাল-১৩ জুন-২০১৪]

উল্লিখিত দুইটি বিশ্ববিখ্যাত ডকুমেন্টের মাধ্যমে জানা গেল যে হযরত নূহ (আ.) ও হযরত সোলায়মান (আ.) আহলে বাইতের ওসিলায় আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আহলে বাইত এবং সাহাবা একটি নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা

পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে আমরা জানতে পারি যে, নবুওতের উত্তরাধিকারী হলেন আহলে বাইত এ রাসূল (সা.) তাঁরা রাসূল (সা.)-এর নিকটতম মানসিক ও চারিত্রিক উভয় দিক দিয়ে আত্মীয়। আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.)-এর দেয়া বিশেষত্বের কারণে তারা সকলের উর্ধ্বে তাদের সমকক্ষ কেউ না। তাঁদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক ঘোষিত সম্মান, মর্যাদা, ক্ষমতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে তাদের স্তরে বা পর্যায়ে কারও পৌঁছা সম্ভব নয়; এবং তাঁরাই 'আহলে বাইত'। আল্লাহ্ আহলে বাইতকেই অপবিত্রতা থেকে মুক্ত রাখার সনদ দিয়েছেন যা সূরা আহযাবের-৩৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে। তাঁদের উপর নামাজে দরূদ পড়া এতটুকু ওয়াজেব যতটুকু ওয়াজেব হুজুর (সা.)-এর উপর দরূদ পড়া [সূরা আহযাবের-৫৬ নম্বর আয়াতে]। মুসলমানদের আয়ের এক পঞ্চম অংশ তথা 'খুমস' তাদেরকে দেয়া ওয়াজেব ঘোষণা করা হয়েছে [সূরা আনফল ৭ আয়াত-৪১ আয়াতে]। তারাই 'উলিল আমর' যাদের আনুগত্য ফরজ করা হয়েছে। [সূরা ০৪ নিসা আয়াত-৫৯ আয়াতে]। তাঁরাই রাসেখুনা ফিল ইলম' যারা কোরআনের আয়াতের মুহকাম ও মুতাসাবেহাত সঠিক ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত [সূরা আল ইমরান আয়াত-৭]। তাঁরাই 'আহলে জিকর' এ যাদের কাছে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণ করার জন্য আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন [সূরা নাহল আয়াত-৪৩]। যাদেরকে রাসূল (সা.) হাদী, সাকলাইন, কোরআনের সাথী তথা সাহেবে কোরআন তথা "সবাক কোরআন হিসাবে" রাসূল (সা.)-কোরআন ও আহলে বাইত একই সংগে থাকার কথা বলেছেন। [কানজুল উমমাল, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৪; মুসনাদে হাম্বল, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৮৮]।

তাদেরকে 'নূহের নৌকা' বলা হয়েছে যাঁরা তাতে উঠলো তারা রক্ষা পেল আর যাঁরা উঠলোনা তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো। [মোসতাদারক-এ-হাকীম, খণ্ড-তৃতীয়, পৃষ্ঠা-১৫১; ৫ সায়ায়েকে মুহরকা, ইবনে হাজার হায়সামী, পৃষ্ঠা-২৩৪]

তাছাড়া আহলে বাইতের এই অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল (সা.) হযরত আলী (আ.)-কে দোজখ ও বেহেশতের বণ্টনকারী, হযরত মা ফাতিমা (আ.) বেহেশতের সম্রাজ্ঞী, ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন (আ.)-কে বেহেশতের যুবকদের সর্দার তথা নেতা বা অভিভাবক ও মালিক হিসাবে ঘোষণা করেছেন, যেখানে কোন বৃদ্ধা/বৃদ্ধ থাকবে না।

এ প্রেক্ষাপটে আমরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাহাবীদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার চেষ্টা করব। সাহাবী' শব্দটি আরবী এক বচন 'সাহেব' বহুবচনে 'সাহাবী' অর্থ জীবন সাথী, সঙ্গী, হামসাফার, সহচর একত্রে একই মত ও পথে জীবনযাপনকারী।

বাংলায় একে একনিষ্ঠ অনুসরণকারী, গুণমুগ্ধ, ভক্ত ও ভাবশিষ্য বা আর্দশের অনুসারী এবং সেই অনুযায়ী নিজের জীবন গঠন করেছেন যিনি। এই সহজ বিষয়টি অত্যন্ত জটিলভাবে উপস্থাপন করে কিছু সংখ্যক আরবী ভাষার বিদ্বান ব্যক্তি অত্যন্ত অসৎ উদ্দেশ্যে 'সাহাবা' শব্দের সংজ্ঞা নির্ধারণ করলেন যে- যে বা যারা রাসূল (দ.)-কে ঈমানের সাথে দেখেছেন তারাই সাহাবা'। অর্থাৎ কোন কারণে রাসূল (দ.)-কে দর্শন করাই একটি বিশেষ মর্যাদা হিসাবে বিবেচনা করা হলো। ফলে ঈমানের সাথে অথবা মৌখিক কলেমা পাঠকারী অথবা মুনাফেকীর উদ্দেশ্যে ইসলামে দাখিল হওয়া বিপুল সংখ্যক ব্যক্তিবর্গকে তাদের সকল প্রকার অবৈধ কাজের যথার্থ মূল্যায়ন না করার একটি বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করা হলো। অর্থাৎ তাদের অবৈধ কাজ করার ঢালাও লাইসেন্স দেয়া হলো। অর্থাৎ সেই আমলের সাধারণ ঈমানদার মৌখিক কলেমা পাঠকারী মুনাফেক ও আল্লাহ্ ও রাসুল (সা.)-এর দৃষ্টিতে প্রকৃত মোমিন-মুত্তাকী ব্যক্তির পার্থক্য করা থেকে মুসলমান জাতিকে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত করা হলো।

তবে পরম করুণাময় আল্লাহ্তায়ালার রহমতে মুসলমানদের মধ্যে প্রকৃত সত্যনিষ্ঠ আলেম যাদের মধ্যে জালাল উদ্দিন সুয়ুতী তার 'খাসায়েস-এ-কুবরা' নামক পুস্তকে 'সাহাবী' ঐ মহান ব্যক্তিদের মধ্যে সীমিত করেছেন যাঁদের কার্যক্রম কোরআন ও রাসূলের সুন্নাহ মোতাবেক সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ, সত্যনিষ্ঠ, চরিত্রসম্পন্ন ও সত্যানুগামী উপরন্ত যাঁরা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ঈমান এনেছেন এবং এ কারণে তাঁরা জান-মাল কোরবানী করেছেন। অথবা অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করেছেন। এ ছাড়া হুদাইবিয়ার সন্ধি, সূরা নূর নাজিল হওয়ার সময় উপস্থিতি এবং সর্বোপরি আমৃত্যু কোরআন ও সুন্নাহর আদর্শের উপর জীবন যাপনকে পরিচালনা করা সাহাবা হিসাবে অন্তর্ভুক্তির প্রধান শর্ত হিসাবে বিবেচনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের ইতিহাস যে এত রক্তাক্ত ঘটনাবহুল, নিষ্ঠুর ও বিতর্কিত তাঁর মূলেই রয়েছেন 'সাহাবা'। কারণ তারাই রাসূল (সা.) উম্মাহকে কিয়ামত পর্যন্ত বিভ্রান্তি থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন সেই অসিয়ত লিখতে দেন নি এবং তাঁর সম্পর্কে এমন আপত্তিকর ও বিভ্রান্তিকর বাক্য উচ্চারণ করেছেন তা দ্বীনি চিন্তা-চেতনার দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য। তাঁরাই উম্মতে মোহাম্মদী দ্বীনকে ফজিলত থেকে বঞ্চিত করে গুমরাহীর দিকে নিয়ে যান। সেজন্য আজ উম্মত শতধা বিভক্ত মতপার্থকের চোরাবালিতে হারিয়ে গেছে। তারাই আল্লাহ্র খিলাফতের ব্যাপারে খোদায়ী বিধান সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে অদূরদর্শী ফয়সালা করতে গিয়ে কিছু লোককে ক্ষমতা পাওয়ার ব্যাপারে অবৈধ সহযোগিতা করেন। ফলে কিছু লোক পরস্পরবিরোধী হয়ে পড়ে এবং এমন কি তাদের মধ্যে রক্তাক্ত সংগ্রামে হাজার হাজার লোক মারা যায়। এরাই তারা যারা আল্লাহ্র কিতাব ও হাদিসে রাসূল (দ.)-এ এখতেলাফ (বিতর্ক মতবিরোধ) সৃষ্টি করেন। ফলে উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন মত, পথ, দৃষ্টিভঙ্গীর, দর্শন, মতবাদ ও আধুনিক পরিভাষায় ইজমের সৃষ্টি হয়। যার সবগুলোই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার মানসিকতার সৃষ্টি। যদি তাঁরা 'সাহাবা না হতেন তাহলে তাদের কৃতকর্মের ফল উম্মত আজ পর্যন্ত ভোগ করত না। অথচ সকলের উপাস্য এক, কলেমা এক, কিতাব এক, রাসূলগণও এক, কেবলা এক সবই ঠিক মিল আছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওফাতের পর সর্বপ্রথম বিভক্তির সূত্রপাত হয় 'সাকিফা-ই-বনি সায়েদায়' যা আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে সাহাবাদের মতামত, কার্যকলাপ, চিন্তাধারা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গ্রহণ বা বর্জন করা প্রয়োজন। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা পবিত্র কোরআন, নির্ভরযোগ্য সুপ্রমানিত হাদিসে রাসূল ও নিরপেক্ষ ইতিহাসের আলোকে বিষয়টি পর্যালোচনা করব।

পবিত্র কোরআনে সাহাবাগণের কার্যকলাপ সম্পর্কে বর্ণনা-

"মদীনাবাসীদের মধ্যে যাহারা তোমাদের আশে পাশে আছে তাহাদের কেহ কেহ/
মোনাফেক এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও কেহ কেহ কপটতায় সিদ্ধ। তুমি উহাদিগকে জানো না, আমি উহাদিগকে জানি। আমি উহাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দেব ও পরে উহারা প্রত্যাবর্তিত হবে মহাশাস্তির দিকে।" [সূরা তওবা, আয়াত-১০১]

"কিছু লোক এমনও আছে যারা বলে যে, আমরা আল্লাহ্ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনিয়াছি, অথচ তারা ঈমান আনে নাই। এরা আল্লাহ্ ও ঈমানদারদেরকে ধোঁকা দিতে চায়। তারা বরং নিজেদেরকে ধোকা দিচ্ছে অথচ বুঝতে পারে না। তাদের অন্তরে রোগ আছে যেটাকে আল্লাহ্ নাফরমানির কারণে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। এখন এই মিথ্যার জন্য তারা কঠিন আযাব পাবে।" [সূরা ০২ বাকারা, আয়াত-৮-১০] ।

"যখন মুনাফিকরা তোমার নিকট আসে তাহারা বলে আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূল। আল্লাহ্ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই আল্লাহ্র রাসূল এবং আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। উহারা উহাদের শপথগুলিকে ঢালরূপে ব্যবহার করে আর উহারা আল্লাহ্র পথ হইতে মানুষকে নিবৃত্ত করে। উহারা যাহা করিতেছে তাহা কত মন্দ। ইহা এজন্য যে, উহারা ঈমান আনিবার পর কুফরী করিয়াছে। ফলে উহাদের অন্তর/হৃদয় মোহর করিয়া দেয়া হইয়াছে, পরিণামে উহারা বুঝে না।" [সূরা ৬৩ মুনাফিকুন, আয়াত-১-৩]

"হে ঈমান আনয়নকারীগণ। তোমাদের মধ্যে কেহ দ্বীন হইতে ফিরিয়া গেলে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ এমন এক সম্প্রদায় আনিবেন যাহাদিগকে তিনি ভালোবাসিবেন এবং যাহারা তাহাকে ভালোবাসিবে, উহারা মুমিনের প্রতি কোমল ও কাফিরদের প্রতি কঠোর হইবে এবং কোন নিন্দুকের ভয় করিবে না। ইহা আল্লাহ্র অনুগ্রহ, যাহাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় সর্বজ্ঞ।" [সূরা ০৫ মায়িদাহ, আয়াত-৫৪]

"উহারা আত্মসমর্পণ করিয়া (ইসলাম গ্রহণ করে) তোমাকে ধন্য করিয়াছে মনে করে। বল, তোমাদের আত্মসমর্পণ আমাকে ধন্য করিয়াছে মনে করিও না; বরং আল্লাহ্ই ঈমানের দিকে পরিচালিত করিয়া তোমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" (সুরা ৪৯ হুজুরাত, আয়াত-১৭]।

"আরববাসীরা বলে আমারা ঈমান আনিলাম। বল, তোমরা ঈমান আন নাই; বরং তোমরা বল আমরা আত্মসমর্পণ করিয়াছি, কারণ ঈমান এখনও তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করে নাই।" [সূরা ৪৯ হুজুরাত, আয়াত-৩]।

"উহাদের মধ্যে এমন লোক আছে যে, সাদকা বন্টন সম্পর্কে তোমাকে দোষারোপ করে, অত:পর ইহার কিছু উহাদিগকে দেয়া হইলে উহারা পরিতুষ্ট হয়, আর ইহার কিছু ইহাদিগকে না দেয়া হইলে তৎক্ষণাৎ উহারা বিক্ষুব্ধ হয়।" [সূরা ৪৭ মুহাম্মদ, আয়াত-১৬]।

"উহাদের মধ্যে এমনও লোক আছে যাহারা নবীকে ক্লেশ দেয় এবং বলে সে তো কর্ণপাতকারী। বল তাহার কান তোমাদের জন্য যাহা মঙ্গল তাহাই শুনে, আল্লাহ্তে ঈমান আনে এবং মুমিনদিগকে বিশ্বাস করে; তোমাদের মধ্যে যাহারা মোমিন সে তাহাদের জন্য রহমত এবং যাহারা আল্লাহ্র রাসূলকে কষ্ট দেয়। তাহাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।" [সূরা ০৯ তওবা, আয়াত-৬১]

"কুফরী ও কপটতায়, আরববাসী কঠোর এবং আল্লাহ্ তাহার রাসূলের প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন, তাহার সীমারেখা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার যোগ্যতা ইহাদের অধিক। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।" [সূরা ০৯ তওবা, আয়াত-৯৭]

"যাদের অন্তরে নেফাকের রোগ আছে, তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ্ তাদের বদ খেয়ালগুলো জনসম্মুখে আনিবেন না? আমি যদি চাই তাহলে তোমাদের এই দেখিয়ে দিতাম। তখন আপনি তাদের ললাট দেখেই চিনতে পারতেন এবং তোমরা তাদের কথাবার্তার ধরন দেখেই চিনতে পারিতে এবং আল্লাহ্ তোমাদের আমল সমূহ সম্পর্কে অবগত।" [সূরা ৪৭ মুহাম্মদ, আয়াত-২৯-৩০]

নিশ্চয়ই কোরআন তথা শরীয়তের সমস্ত হুকুম আহকাম ও ইসলামী আকীদা সমূহ আমাদের পর্যন্ত সাহাবাদের মাধ্যমেই এসেছে এবং কেউ এ কথা দাবী করে না। যে, সে আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত ব্যতিরেকে

আল্লাহ্‌র ইবাদত করে এবং ইসলামের এই দুটি মূল ভিত্তি পর্যন্ত পৌছানোর জন্য সাহাবীগণই হলেন মাধ্যম। যেহেতু রাসূল (সা.)-এর ওফাতের পরে সাহাবীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়ে যায় এবং তাঁরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন একে অপরের প্রতি গালি-গালাজ ও লা'নত মনোমালিন্যে লিপ্ত হয়ে যান। এমন কি একজন আর একজনকে হত্যাও করেছেন, সেহেতু এমন অবস্থার প্রেক্ষিতে যাচাই-বাছাই ছাড়া তাদের কাছ থেকে দ্বীনের হুকুম-আহকাম গ্রহণ করা অসম্ভব। অনুরূপভাবে তাঁদের পরিবেশ, পরিস্থিতি ও ইতিহাস পর্যালোচনা না করেই, নবীর (সা.) জীবদ্দশাতে ও ইন্তেকালের পর তাদের ভূমিকা, কার্যকলাপ মতামত, চিন্তাধারা, কোরআন ও হাদিস সম্পর্কে তাঁদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অবশ্যই পরীক্ষা-নিরিক্ষা ছাড়া তাদের পক্ষে বিপক্ষে কোন রায়ের সিদ্ধান্ত নেয়া অসম্ভব। আমরা হক কে বাতিল থেকে এবং মুমিনকে মুনাফিক হতে পৃথক পৃথক করে দেখি যে কারা উল্টা পথে ফেরত চলে গিয়েছিলেন এবং কারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, তাঁদেরকে চিহ্নিত করি। অথচ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এক শ্রেণীর মুসলিম আলেম বা বুদ্ধিজীবী বিষয়টির গভীরে যেতে আগ্রহী নন এমন কি এবিষয়ের যে গুরুত্ব রয়েছে তা বিবেচনায়ই আনেন না; বরং নির্দ্বিধায় তাঁদের প্রতি দরূদ ঐভাবেই পাঠান ঠিক যেভাবে মুহাম্মদ (সা.) ও আলে মুহাম্মদের প্রতি দরূদ প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

এখন এই ধরণের বুদ্ধিজীবী/ফকীহদের কাছে প্রশ্ন করা যেতে পারে সাহাবাদের সমালোচনা করলে কি মানুষ ইসলামের গন্ডী থেকে বেরিয়ে যাবে এটার কারণে আল্লাহ্‌র কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাতের বিরোধিতা বলে গন্য হবে? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য আমাদের নবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় ও তিরোধানের পর বিভিন্ন সাহাবার কার্যকলাপ ও কথাবার্তা বিশ্লেষণও পর্যালোচনা করতে হবে এবং যার উত্তর আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সিয়াহ-সিত্তার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাসেই পেয়ে যাব। ইতিপূর্বে আমরা পবিত্র কোরআনের যে দশটি আয়াত উল্লেখ করেছি তার মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি সাহাবাদের মধ্যে কিছু কিছু মুনাফিক, ফাসেক, জালিম, মিথ্যাবাদী, মুশরিক ও কুফরের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী ব্যক্তিবর্গ ছিলেন এবং সেই সাথে আল্লাহ্‌ ও রাসূল কে কষ্ট দানকারী ব্যক্তিবর্গও ছিলেন।

স্বয়ং রাসূল (সা.) যখন নিজ নফসের খায়েশ মোতাবেক কিছুই বলতেন না; বরং এ বিষয়ে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করতেন না। তিনি আমাদের এই সংবাদ দিয়েছেন যে, সাহাবাদের মাঝে মুরতাদীন, মারেকীন, নাসেকীন, ক্বাসেতীন এবং তাঁদেরই মাঝে ঐ ব্যক্তিরাও আছে যারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে এবং সাহাবী হওয়ার বিষয়টি তাদের কোন উপকারেই আসবে না; বরং রাসূল (সা.)-এর সংস্পর্শ বা সাহচর্য তাদের জন্য হুজ্জাত বা দলিল হয়ে যাবে এবং তাদের শাস্তি বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

রাসূল (সা.)-এর ওফাতের পরে যে কিছু সংখ্যক সাহাবা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ধর্ম থেকে খারিজ হয়ে যাবে, বিষয়টি এ মর্মে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে। এরশাদ হচ্ছে-

"মুহাম্মাদ একজন রাসূল মাত্র, তাহার পূর্বে বহু রাসূল গত হইয়াছে। সুতরাং সে যদি মারা যায় অথবা সে নিহত হয় তবে কি তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে এবং কেহ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে সে কখনও আল্লাহ্‌র ক্ষতি সাধন করবে না; বরং আল্লাহ্‌ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদিগকে পুরস্কৃত করবেন।" [সূরা ০৩ আলে ইমরান, আয়াত-১৪৪]

আলোচ্য আয়াতে করীমা থেকে এটাই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, কিছু সংখ্যক বিজ্ঞ বুদ্ধিজীবী বা ফকীহ দাবী করেন রাসূল (সা.) এর সাহাবাদের সাথে মুনাফেকদের কোন সম্পর্ক নাই, এই আয়াতের সম্পর্ক হচ্ছে ঐ সমস্ত সাহাবাদের সাথে যারা নবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় মুনাফেক ছিলেন না। কিন্তু তাঁরা ওফাতের পর তাদের পূর্বেকার অবস্থানে ফেরত চলে গিয়েছিলেন। তাঁদের প্রকৃত অবস্থা তখনই সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যখন আমরা নবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় ও তার ইন্তেকালের পর সাহাবাদের কার্যাবলী পর্যালোচনা করবো এবং তাঁদের সম্বন্ধে রাসূল (সা.)-এর হাদিসের প্রতি লক্ষ্য করবো এবং তাঁদের সম্পর্কে রাসূল (সা.)-এর হাদিসসমূহে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস গ্রন্থে সর্বোপরি কোরআনের আলোকে বিশ্লেষণ করবো।

আল্লাহ্‌র অপছন্দনীয় কাজ যা সাহাবারা করেছেন এ মর্মে কোরআনের বর্ণনা-

১। বার আ ইবনে আজীব (রা.) যিনি বৃক্ষের নীচে রাসূল (সা.)-এর হাতে বায়াত গ্রহণ করেছেন, তিনি বলেন ভাতিজা বৃক্ষের নীচে রাসূল (সা.)-এর হাতে আমার ও বায়াত গ্রহণ করা এবং তাঁর সহবত পাওয়ার বিষয়টি তোমাকে যেন ধোকায় না ফেলে দেয়। কারণ তুমি জান না যে রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পর আমরা কি না করেছি। অথচ বৃক্ষের নীচে বায়াত করে তারা তো আল্লাহ্‌রই হাতে বায়াত করে।

"আল্লাহ্‌র হাত তাহাদের উপর অত:পর যে উহা ভঙ্গ করে, উহা ভঙ্গ করিবার পরিণাম তাহারই এবং যে আল্লাহ্‌র সহিত অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি অবশ্যই তাহাকে পুরস্কার দেবেন।" [সূরা ৪৮ ফাতির, আয়াত-১০; সহীহ বুখারী, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৬, কিতাবুল মাগাজী অধ্যায়]।

অনেক সাহাবা তো রাসূল (সা.) এর চাচাতো ভাই ও জামাই, প্রখ্যাত আহলে বাইতের মহাসম্মানিত সদস্য আলী ইবনে আবি তালিব (আ.)-এর কাছে ওয়াদা করিয়ে নেন যে, তিনি যেন বাইয়াত ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। যা ইতিহাসে জামালের যুদ্ধ (৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে) নামে লিপিবদ্ধ করা হয়।

বুখারী জাবীর ইবনে আব্দুল্লাহ হতে রেওয়ায়েত করেছেন, শাম (সিরিয়া) হতে একটি কাফেলা আগমন করে। তারা নিজেদের খাবার-দাবারও সঙ্গে এনেছিল। আমি নবী (সা.)-এর পিছনে নামাজ পড়ছিলাম। যখন লোকেরা কাফেলা আগমনের শব্দ পেল তখন অনেকে নামাজ ভঙ্গ করে পালিয়ে গেল। মাত্র দুই চারজন জামাতে হাজির ছিল। তখনই এই আয়াতটি নাযিল হয়-

"তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রাখিয়া উহার দিকে ছুটিয়া গেল।" [সূরা ৬২ জুময়া, আয়াত-১১]

আমরা আরো সন্ধান চালিয়ে জানতে পেরেছি যে, কৃতজ্ঞ লোকেদেরকে কোরআন প্রশংসা করেছে যাদের সংখ্যা নগন্য, যারা নামাজ ছেড়ে আনন্দফুর্তির জন্য পালিয়ে যায় নি এবং তাঁরাই সেই ব্যক্তি যারা বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে রাসূল (সা.)-এর সাথে দৃঢ়ভাবে ছিলেন এবং বাকীরা পেছন থেকে পালিয়ে যায়। বুখারী, বার আ ইবনে আজীব হতে রেওয়ায়েত করেছেন- ওহুদ যুদ্ধে রাসূল (সা.) আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের নেতৃত্বে ৫০ জন লোককে একটি টিলার উপর পাহারায় বসিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাদের নিকট কোন সংবাদ না পাঠাই ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা জায়গা থেকে নড়বে না, যদিও তোমরা দেখ যে, পাখি বা অন্য কোন জন্তু আমাদের ছিড়ে খাচ্ছে। অথচ ইসলামী সৈন্যরা কাফেরদেরকে পরাজিত করে দিল তখন ইবনে যোবায়ের বলেন- আমি নারীদিগকে দ্রুতগতিতে পালাতে দেখি, তাঁদের হাঁটুর নীচে পর্যন্ত খোলা দেখি এবং তাঁদের কাপড় চোপড় সংকুচিত করে নিয়েছিল। আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের এর সাথীগণ গনিমত, গনিমত বলে চিৎকার শুরু করে দেয় এবং বলে যে, তোমাদের সৈন্যরা বিজয় অর্জন করেছে, তখন আর কি দেখছো আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের বলেন, তোমরা কি রাসূলের কথা ভুলে গেলে?

তাঁর সঙ্গীরা বলেন আল্লাহ্‌র কসম, আমরা অবশ্যই লোকজনের মাল থেকে নেবই। অত:পর তাঁরা যখন কাফেরদের নিকটবর্তী হলো তখন তাঁরা (কাফেররা) পাল্টা আক্রমণ চালায় এবং মুসলমানরা পরাজিত হয়। রাসূল (সা.) যখন তাঁদেরকে ডাক দিলেন তখনও তাঁর সাথে মাত্র দুইচার জন সাহাবী ছিলেন। বর্ণনাকরী বলেন উক্ত যুদ্ধে আমাদের ৭০ জন যোদ্ধা নিহত হয়। ওহুদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাঁদের পলায়নকে আল্লাহ্‌ এ ভাবে বর্ণনা করেন-

"আল্লাহ্‌ তোমাদের সাথে তাঁর প্রতিশ্রুতিপূর্ণ করেছিলেন যখন তোমরা আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে তাদেরকে বিনাশ করতেছিলে। যে পর্যন্ত না তোমরা সাহস হারাইলে এবং নির্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ সৃষ্টি করিলে এবং যাহা তোমরা ভালবাস তা তোমাদেরকে দেখাইবার পর তোমরা অবাধ্য হলে তোমাদের কতক ইহকাল চাহিতেছিল এবং কতক পরকাল চাহিতেছিল। অতঃপর তিনি পরীক্ষা করার জন্য তোমাদিগকে তাহাদের হইতে ফিরাইয়া দিলেন। অবশ্য তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিলেন এবং আল্লাহ্‌ ঈমান আনয়নকারীদের প্রতি অনুগ্রহশীল। স্মরণ কর, তোমরা যখন উপরের দিকে দৃষ্টি দিতেছিলে এবং পিছন ফিরিয়া কাহারও প্রতি লক্ষ্য করিতেছিলেন, আর রাসূল (সা.) তোমাদেরকে পিছন দিকে আহবান করিতেছিল। ফলে তিনি তোমাদেরকে বিপদের উপর বিপদ দিলেন যাতে তোমরা যা হারিয়েছ অথবা যে বিপদ তোমাদের উপর এসেছে তার জন্য তোমরা দুঃখিত না হও। তোমরা যা কর আল্লাহ্‌ তা বিশেষভাবে অবহিত।" [সূরা ০৩ আল ইমরান, আয়াত-১৫২-১৫৩]

ওহুদ যুদ্ধ থেকে পলায়ন যদি তাঁদের জঘণ্য অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে হুনাইনের যুদ্ধ হতে পলায়নকে জঘণ্যতম অপরাধ বলতে হবে। কারণ, ওহুদ যুদ্ধে রাসূল (সা.)-এর পাশে মাত্র ৪জন ধৈর্যশীল সাহাবী উপস্থিত ছিলেন অর্থাৎ ২৫০ জনের মধ্য হতে একজন। কিন্তু হুনাইনের যুদ্ধে ১২০০০ মুসলানদের মধ্য হতে মাত্র ১০ জন সাহাবী নবীর পাশে উপস্থিত ছিলেন, বাকী সবাই পলায়ন করেছিলেন অর্থাৎ প্রতি ১২০০ জনের মধ্যে মাত্র ১ জন। হুনাইনের যুদ্ধ ৮ম হিজরী (৬৩০ খ্রিস্টাব্দে) অর্থাৎ নবুয়তের শেষের দিকে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তারপর নবী (সা.) মাত্র ২বৎসর বেঁচে ছিলেন। অতএব এতো বিপুল সংখ্যা এবং লোকবল থাকা সত্ত্বেও এমন কি মুসিবত হাজির

হয়েছিলো যে তাঁরা রাসূল (সা.) কে শত্রুদের বেষ্টনীতে ফেলে রেখে এমনভাবে পলায়ন করেছিলেন যে, হযরত রাসূল (সা.)-এর জীবন প্রদীপেরও কেউ কোন চিন্তা করেন নি, কোরআন মজীদ তাঁদের এই হীন ও নীচ কর্মকান্ড এবং যুদ্ধক্ষেত্রে হতে পলায়নকে বিস্তারিতভাবে বয়ান করেছে। এরশাদ হচ্ছে-

"আল্লাহ্ তোমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন বহু ক্ষেত্রে এবং হুনায়নের যুদ্ধের দিনে যখন তোমাদিগকে উৎফুল্ল করিয়াছিল তোমাদের সংখ্যাধিক্য, কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসে নাই এবং বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকুচিত হইয়াছিল ও পরে তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া পলায়ন করিয়াছিলে। অতঃপর আল্লাহ্ তাহার নিকট হইতে তাহার রাসূল ও মুমেনদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং এমন এক বাহিনী অবতীর্ণ) করেন যাহা তোমরা দেখিতে পাও নাই এবং তিনি কাফিরাদিগকে শাস্তি প্রদান করেন, ইহাই কাফিরদের কর্মফল।" [সূরা ০৯ তওবা, আয়াত ২৫-২৬]।

বুখারী কাতাদাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বললেন যে, হুনাইন যুদ্ধে আমি যখন একজন মুসলমানকে একজন মুশরিকের সামনে যুদ্ধরত দেখলাম এবং ঐ মুশরিকের পিছনে আর এক মুশরিক লুকিয়ে ছিল, সে ধোঁকা দিয়ে মুসলমানকে হত্যা করতে চেয়েছিলো। আমি দ্রুত ঐ ধোঁকাবাজের দিকে অগ্রসর হলাম। সে আমাকে আঘাত করার জন্য হাত উত্তোলন করলো, আমিও তার হাতের উপর আঘাত করি এবং তার হাত কেটে যায়। কিন্তু সে আমাকে ধরে ফেলে এবং এত কঠিনভাবে চাপ সৃষ্টি করল যে আমি ভয় পেয়ে গেলাম, যখন তাঁর বেষ্টনীতে একটু ঢিল পড়লো তখন আমি ধাক্কা দেই তারপর তাকে হত্যা করি। পরে মুসলমানরা পরাজিত হয়, তখন আমিও পরাজিত হই। উমর ইবনে খাত্তাবের সাথে যখন আমার সাক্ষাৎ হয় আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে লোকজনের কি হয়েছে? তখন উমর বলেন- এটাই তো আল্লাহ্র হুকুম। উমর (রা.) হুনাইন যুদ্ধের অন্যান্য ফেরারীদের সাথেই পলায়ন করেছিলেন সে কারণেই পলায়নকারীদের মধ্য থেকে আবু কাতাহদাহকে উমরের সাথে কথা বলতে দেখা যায়। কাতাদাহ আশ্চর্য হয়ে উমর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন যে, লোকজনের কি হয়েছে। উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) যুদ্ধক্ষেত্রে পলায়ন ও রাসূল (সা.) শত্রুদের বেষ্টনীতে ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে তিনি নির্বিকার এবং এই কাজের যৌক্তিকতা হিসাবে কাতাদাহকে প্রবোধ দিচ্ছেন, এটাই তো আল্লাহ্র হুকুম অথচ পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে -

"হে মুমিনগণ। তোমরা যখন কাফির বাহিনীর সম্মুখীন হইবে তখন তোমরা
পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে না।" (সূরা ০৮ আনফাল, আয়াত-১৪)

বস্তুত আল্লাহ্ পাক তাঁকে ও তাঁর সংঙ্গীদেরকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে না পালানোর জন্য এ ভাবে অংগীকার নিয়েছিলেন- "ইহারা তো পূর্বেই আল্লাহ্র সাথে অঙ্গীকার করিয়াছিল যে, ইহারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে না। আল্লাহ্র সাথে কৃত অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হইবে" [সূরা ৩৩ আহযাব, আয়াত-১৫]।

রাসূল (সা.)-এর জীবিতাবস্থায় তাঁর নির্দেশ পালনে সাহাবীদের অনীহা

আমরা নবী (সা.)-এর ঐ সব আদেশ নিষেধ দিয়ে শুরু করছি যেগুলি তিনি তাঁর জীবদ্দশায় সাহাবাদের প্রতি জারী করেন অথচ সাহাবারা সেগুলির প্রতি অমান্য এবং অবাধ্যতা প্রদর্শন করেছিলেন।

সহীহ বুখারীর ৩য় খন্ডে হুদায়বিয়ার ঘটনা এবং রাসূল (সা.)-এর সাথে উমর ইবনে খাত্তাব কথাবার্তার পরেও সন্ধির পক্ষে রাসূল (সা.)-এর দৃঢ়তা দেখে উমর (রা.)-এর সন্দেহ এতো দূর পর্যন্ত গড়িয়ে ছিল যে তিনি (উমর) এক পর্যায়ে বলেই ফেললেন আপনি কি আল্লাহ্র নবী নন? এ সম্পর্কে লেখা হয়েছে যে, নবী (সা.)। যখন সন্ধি সম্পাদন করার পর সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বললেন- উঠ স্ব স্ব কোরবানী দাও এবং মাথার চুল মুন্ডন করো।

বুখারী লিখেছেন যে, সাহাবীদের মধ্য হতে কেউ উঠলেন না, এমন কি উক্ত নির্দেশ রাসূল (সা.) তিন বার উচ্চারণ করেন, তাঁর পরেও কেউ উঠলেন না। তারপর তিনি (সা.) উম্মে সালমার কাছে এসে সাহাবীদের ঔদ্ধত্যের কথা এবং তাঁর নির্দেশ পালন না করার বিষয়টি জানান। [সহীহ বুখারী, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা-১৮]

বুখারী তাঁর সহীহ'র ৫ম খন্ডের কিতাবুল মাগোযীত এ জহুরী হতে, তিনি সালেম হতে এবং তিনি তাঁর পিতা হতে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন-

রাসূল (সা.) খালিদ বিন ওয়ালিদকে বনি জাযিম গোত্রের নিকট পাঠালেন যেন তাঁদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য দাওয়াত দেন। কিন্তু তাঁরা আসল না, আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম এ কথা বলাটা তারা পছন্দ করে নি; বরং তাঁরা বললো আমরা মূর্তি পূজা ছেড়ে দিয়েছি। এ অত:পর খালিদ বিন ওলীদ তাঁদের কিছু লোককে হত্যা করেন, অনেককে বন্দী করেন এবং আমাদের প্রত্যেকের হাওলায় একটি করে কয়েদী দিলেন।

এমনকি একদিন খালিদ ঐ বন্দীদের হত্যার নির্দেশ দিলেন। তখন আমি বল্লাম, আল্লাহ্‌র কসম আমি আমার বন্দীকে হত্যা করবো না। আর না আমার সঙ্গীরা তাঁদের বন্দীকে হত্যা করবে। উক্ত ঘটনার সংবাদ যখন নবী (সা.) পেলেন, তখন নিজ হস্তদ্বয় আকাশ পানে উত্তোলন করে তিন বার বললেন, পরওয়ারদিগার, খালিদ বিন ওয়ালিদ যা করেছে তাঁর দায়দায়িত্ব থেকে আমি মুক্ত। অত:পর তিনি হযরত আলী (আ.)-কে বনি জযিমার কাছে পাঠিয়ে তাঁদের জান মালের ক্ষতিপূরণ দেন। [সহীহ বুখারী, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১০৭ এবং খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-১১৮]।

ইতিহাসবিদগণ উক্ত ঘটনাকে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন এবং তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন যা খালিদ বিন ওয়ালীদ এবং তাঁর আনুগত্যকারী সঙ্গীরা কেন এই অপরাধ করলো? আর মুসলমানদের হত্যা করা হারাম, রাসূল (সা.)-এর এই হুকুমকে মান্য করে নি। ঐ হত্যা হলো সবচাইতে বড় অপরাধ যার মাধ্যমে নেকবান্দাদের রক্ত ঝরানো হয়ে থাকে। নবী (সা.) তো খালিদকে ইসলামের দাওয়াত দিতে পাঠিয়েছিলেন নাকি হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু খালিদের উপর জাহেলিয়াত যুগের শত্রুতা এবং শয়তান ভর করেছিল। তাঁর কারণ হলো যে বনি জাযিমা জাহেলিয়াতের যুগে খালিদের চাচা আল ফাঁকা ইবনুল মুগীরাহকে হত্যা করেছিলো সে কারণেই খালিদ তাঁদেরকে ধোকা দেন এবং নিজ বাহিনীর লোকজনকে বলেন যে, তোমরা অস্ত্র রেখে দাও কারণ তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারপর হুকুম দিলেন যে সবার হাত পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেল এবং তাঁদের মধ্য হতে অনেককেই হত্যা করলেন।

বুখারী তাঁর সহীহর ৫ম খন্ডের কিতাবুল মাগাযীত এ ইবনে ওমর (রা.) হতে রেওয়ায়েত করেন যে, ইবনে উমর বলেন-

রাসূল (সা.) হযরত উসামা (রা.)-কে একটি দলের নেতা নিযুক্ত করলেন, লোকজন তাঁর নেতৃত্বের প্রতি আপত্তি জানায়। যখন রাসূল (সা.) বলেন, তোমরা যদি তাঁর নেতৃত্বের প্রতি সন্তুষ্ট নও, তাহলে তোমরা তার পিতার নেতৃত্বের প্রতিও সন্তুষ্ট ছিলে না। আল্লাহ্‌র কসম তাঁরাই নেতৃত্বের উপযুক্ত ছিল এবং আমার সবচেয়ে বেশী প্রিয়ভাজন ছিলেন এবং তাঁদের পরে এই (উসামা) আমার নিকট প্রিয়।

উক্ত ঘটনাকে ইতিহাসবিদগণ বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন যে, সাহাবারা রাসূল (সা.)-কে এতো পরিমান রাগান্বিত করেছিলেন যে, তিনি (সা.) বিরোধিতাকারীদের প্রতি লা'নত করেছেন। উসামা হচ্ছেন সেই যুবক নেতা যার বয়স ছিল মাত্র ১৭ বছর। রাসুল (সা.) তাকে যে বাহিনীর নেতা বানিয়েছিলেন সেই বাহিনীতে আবু বকর, উমর, তালহা, যুবায়ের, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) এবং কোরায়েশের আরো অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু ঐ বাহিনীতে আলী ইবনে আবি তালিব ছিলেন না। বুখারী তাঁর সহীহর ৮ম খণ্ডের 'কিতাবুল এতেসাম বিল কিতাব ওয়াল সুন্নাহ' অধ্যায়ে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস হতে বর্ণনা করেছেন-

ইবনে আব্বাস বলেন যে, রাসূল (সা.)-এর মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে এলো তখন সাহাবীদের দ্বারা রাসূল (সা.)-এর গৃহ পরিপূর্ণ ছিল, তাদের মাঝে উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) ছিলেন, রাসূল (সা.) বলেন, লেখার উপকরণ নিয়ে এসো আমি একটি ওসীয়ত লিখে দেই যাতে তোমরা কখনো গোমরাহ হবে না, উমর (রা.) বলেন, নিঃসন্দেহ নবীর মৃত্যু যন্ত্রণা বৃদ্ধি পেয়েছে, আর আমাদের মাঝে তো কোরআন আছেই। আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কিতাব যথেষ্ট। এ কথা শুনে উপস্থিত সাহাবাদের মাঝে বিবাদ সৃষ্টি হলো এবং চেচামেচি তুঙ্গে উঠলো। কেউ বললো নবী (সা.)-কে ওসীয়ত লিখতে দাও, যেন আমরা গোমরাহ না হয়ে পড়ি।

আবার কেউ কেউ উমরের (রা.) কথার সাথে তাল মিলাল। নবীর (সা.) সমুখে যখন হৈ চৈ তুংগে উঠে গেল তখন তিনি বলেন তোমরা আমার কাছ থেকে বেরিয়ে যাও। ইবনে আব্বাস বলেন যে, এটাই হলো সবচেয়ে বড় মুসিবত যে, রাসূল (সা.)-কে ঐ ওসিয়তটি লিখতে দেয়া হয় নি।

অনেক হাদিসবেত্তা ও ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) রাসূল (সা.)-এর সামনে বলেছেন- "লোকটি প্রলাপ বকছে (নাউজুবিল্লাহ) অথচ রাসূল (সা.) তাদেরকে যখন তাঁর সম্মুখ থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন, তখন সবাই বের হয়ে গেলেন। এই নির্দেশকে কেহ 'প্রলাপ' বলে মনে করলেন না; বরং তারা রাসূল

(সা.)-এর এই আদেশকে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের নির্দেশ বলে মেনে নিলেন। তাই বিষয়টি গভীর গবেষণার দাবী রাখে এবং বেশীরভাগ সাহাবাই উমরের (রা.)-এর বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করেন। এখন আমরা বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখতে পাই যে, রাসূল (সা.)-এর এই নির্দেশ- "তোমরা লেখার উপকরন নিয়ে আস" এই বক্তব্যের মধ্যে কি অসংলগ্নতা বা বৈসাদৃশ্যতা ও বা অস্বাভাবিকতা রয়েছে যাতে তা রোগ জনিত প্রলাপ বলা যেতে পারে। উমর (রা.) অসীয়ত না করার ব্যাপারে দৃঢ় অবস্থান নেন এবং এর যৌক্তিকতা হিসাবে কোরআনই আমাদের জন্য যথেষ্ট বলে মত প্রকাশ করেন। ফলে মুসলিম উম্মাহ হাদিসে রাসূল, বা রাসূল (দ.) এর নির্দেশের মর্যাদা ও গুরুত্বের প্রয়োজনীয়তা নাই মর্মে বিবেচনা করতে শিখল। ফলে তাঁর মূল ধর্ম থেকে যে বিচ্যুত হয়ে গেল তথা পবিত্র কোরআনের মূল শিক্ষা- "রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন সেটা বর্জন করো এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কঠিন আযাব দানকারী।"
আল্লাহ্ তাঁর রাসূল (সা.)-এর বিরোধিতা করার জন্য কঠিন আযাবের হুমকি দেয়া সত্ত্বেও কিছু কিছু সাহাবা আল্লাহ্ কর্তৃক আযাবের হুমকি এবং নিষেধাজ্ঞাকে কোন আমলেই নিতেন না, তাঁদের মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য যখন বিদ্যমান ছিলই তখন ওঁদের মুনাফেকীতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। যদিও তারা প্রকাশ্যে বেশী বেশী নামাজ পড়তেন, রোজা রাখতেন ইত্যাদি। আবার অনেকে এমন বাড়াবাড়ি করতেন, যে কাজগুলি স্বয়ং রাসূল (সা.) করেছেন তা থেকে বিরত থাকতেন বা তা অপছন্দনীয় বিবেচনা করতেন।

সাহাবাদের শ্রেণী বিভাগ

আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)-এর বিভিন্ন ধরনের সাহাবীদের কর্মকান্ড বিশ্লেষণ করেন সত্যান্বেষী আলেমগন সাহাবাদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন একনিষ্ঠ সাহাবী, দোদুল্যমান সাহাবী ও মুনাফেক সাহাবী।

১. **একনিষ্ঠ সাহাবীঃ** এরা হলেন সেই সব বুজর্গ সাহাবী, যারা আল্লাহ্ ও রাসূলকে সত্য ও সঠিকভাবে মেনেছেন, আনুগত্য নিষ্ঠার সাথে করেছেন। মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নবীর প্রতি ভালোবাসাকে সর্বোপরি স্থান দিয়েছেন। কথায় ও কাজে রাসূল (সা.)-এর প্রকৃত সাহাবী ছিলেন। রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পর তাঁরা পরিবর্তিত হননি; বরং তাঁদের প্রতিজ্ঞায় তাঁরা অটল ছিলেন, আর তারাই সেই সব মহান সাহাবী যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ কোরআনে প্রশংসা করেছেন সম্মানিত করেছেন। রাসূল (সা.) ও বিভিন্ন স্থানে তাদের উচ্চ মর্যাদার কথা বলেছেন।

২. **দোদুল্যমান সাহাবীঃ** এরা হলেন সেই সব সাহাবী যারা ইসলাম গ্রহণ করে, রাসূল (সা.)-এর আনুগত্যও করে, কোথাও ভয়ে আবার কখনও আবেগে তাঁরা হুজুর (সা.)-এর সাথে মুসাহেবী করে বলতো আমরা ঈমান এনেছি, আবার কখনও তাঁকে কষ্টও দিত। হুজুর (সা.)-এর আদেশ নিষেধও যথাযথভাবে পালন করতো না; বরং সুস্পষ্ট ও অকাট্য নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও নিজের মতকে গুরুত্ব দিতেন। কখনো কোরআন তাঁদের এহেন কর্মকান্ডের ব্যাপারে হুঁশিয়ারী ও ধমক দিয়েছে। হুজুর (সা.) অনেক সময় তাঁদের শাসন করেছেন।

৩. **মুনাফেক সাহাবীঃ** সেই মুনাফেক যারা হুজুরের সাথে শুধু অনিষ্ট করার জন্য থাকতো। প্রকাশ্যে মুসলমান ছিল কিন্তু আসলে ছিল কাফের, ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্যই শুধু তাঁরা রাসূলের (সা.) সঙ্গে থাকতো। কোরআনের সূরা মুনাফেকুন তাদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়। কোরআনের অনেক জায়গায় তাদের সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে যে তাদেরকে জাহান্নামের ভয়াবহ এক স্থানে রাখা হবে। হুজুর (সা.) তাঁদেরকে বহু নসিহত করেছেন। নবী করিম (সা.) ও সেই মুনাফেকদের থেকে সাবধান থাকতে বলেছেন। অনেক সাহাবাকে এই সব মুনাফেকদের নাম, আচরণ ও তাঁদের আলামত বলে দিয়েছেন।

এই বিষয়টি সঠিক মূল্যায়ন করে সাহাবাদের সঠিক মর্যাদা নির্ধারণ করা উচিত। অনুরূপভাবে হাদিস গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও হাদিসের বিষয়বস্তু, কোরআনের সাথে বর্ণিত বিষয়বস্তুর ও দ্বীন ইসলামের মূলনীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা বিশ্লেষণ পর্যালোচনা পূর্বক হাদিস গ্রহণ বা বর্জন করা উচিত।

নব উদ্ভাবিত ও পরস্পর বিরোধী হাদিস সম্পর্কে মাওলা আলী (আ.)

এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে হযরত আলী (আ.) বলেন- "নিশ্চয়ই মানুষের সম্মুখে যা আছে তার মধ্যে ঠিকও আছে বেঠিকও আছে, সত্যও আছে মিথ্যাও আছে, এ বাতিলকারকও আছে বাতিলকৃতও আছে, সাধারণও আছে নির্দিষ্টও আছে সুনির্ধারিত আছে। এমন কি রাসূল (সা.)-এর অঙ্গীকারের উপরও মিথ্যা আরোপ করা হয়েছিল এই পর্যন্ত যে তিনি (রাসূল সাঃ) খুত্বা দিতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন: যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করে সে জাহান্নামে তাঁর আবাসস্থল তৈরি করে। তোমাদের মধ্যে হাদিস এসেছে চার শ্রেণীর লোক এদের কোন পঞ্চম নাই। প্রথম মুনাফেক যে ঈমানের বেশ ধারণকারী এবং ইসলামের সঙ্গে শিষ্টাচারী সে পাপ করতে ইতস্ততঃ করেনা। সে ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূল (সা.)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করে থাকে। কিন্তু মানুষেরা জানতে পেরেছে যে সে মুনাফিক এবং মিথ্যা আরোপকারী তার নিকট থেকে তাদের কিছুই গ্রহণ করা উচিত না এবং তাঁর কথার সত্যায়ন করাও উচিত না, কিন্তু তারা বলে, রাসূল (সা.)-এর সাহাবী সে তাকে দেখেছে, তাঁর কথা শুনেছে এবং তাঁর নিকট থেকে (অন্যায়ভাবে) জ্ঞান অর্জন করেছে। তাঁর নিকট থেকে তারা তার কথা গ্রহণ করে। আল্লাহ্ অবশ্যই মুনাফিকদের সম্পর্কে তোমাদেরকে ভালভাবে সতর্ক করেছেন এবং তাদের সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যদ্বারা তিনি তাদেরকে তোমার জন্য বিবৃত করেছেন। তৎপরও তারা নবী করীম (সা.)-এর পরও অবস্থান করেছে। তাঁরা পথভ্রষ্ট নেতাদের এবং মিথ্যা দোষারোপের মাধ্যমে জাহান্নামের পথে আহবানকারীদের নৈকট্য লাভ করেছে। আর তারা তাদেরকে নির্দেশ দানকারী ব্যবস্থাপক নিয়োগ করেছে, আর মানুষের ঘাড়ের উপর তাদেরকে কর্মকর্তা বানিয়ে দিয়েছে এবং এদের পদের মাধ্যমে দুনিয়ার ধনদৌলত উদরস্থ করেছে। নিশ্চয়ই মানুষেরা সব সময়ই শাসকদের সঙ্গে থাকে। এবং দুনিয়াদারীতে লিপ্ত থাকে কেবল মাত্র আল্লাহ্ তাহাদেরকেই রক্ষা করলেন তাদের ব্যতীত এরাই চার দলের একদল।

তারপর ঐ সব লোক যারা রাসূল (সা.)-এর কাছে কিছু শুনেছে কিন্তু মুখস্ত করে নাই, সে তার মধ্যে কেবল ধারণা করেছে। সে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলে না, এখন সে ঐ কথা তার সাথে বহন করে, তা বর্ণনা করে, সে অনুযায়ী কাজ করে আর সে দাবী করে যে, সে তা রাসূল (সা.) নিকট থেকে শুনেছে। যদি মুসলমানেরা জানতে পারে যে, সে এ বিষয়টির মধ্যে ভুল করেছে তবে তারা এটা তাঁর নিকট থেকে গ্রহণ করবে না এবং সে নিজে যদি জানতে পারে যে, তা ঐরূপ তবে সে তা পরিত্যাগ করবে।

এবং তৃতীয় ব্যক্তি যে সে রাসূল (সা.)-এর নিকট থেকে শুনেছে, তিনি কোন ব্যাপারে আদেশ করেছেন তৎপর তা নিষেধ করেছেন আর সে তা জানেনা, অথবা সে কোন জিনিস সম্পর্কে নিষেধ করতে শুনেছে তৎপর তিনি তা করতে আদেশ করেছেন আর সে তা জানে না, তখন সে যা বাতিলকৃত তাই স্মরন করে রেখেছে, যা রদ করা হয়েছে তাই স্মরণ করে রাখে নাই। সে যদি জানতে পারত তা রহিত হয়ে গেছে তা হলে সে তা পরিত্যাগ করত অথবা মুসলমানরা জানত, যখন তারা তাঁর নিকট থেকে তা শুনত যে বাতিল হয়ে গেছে তা হলে তারা তা পরিত্যাগ করত এবং সর্বশেষ চতুর্থজন সে কখনই আল্লাহ্ বা তাঁর রাসূল (সা.) সম্পর্কে কোন মিথ্যা আরোপ করে না। সে আল্লাহ্র ভয়ে এবং রাসূল (সা.)-এর সম্মানের জন্য মিথ্যাকে ঘৃণা করে এবং সে কখনও। কল্পনাতেও নেয় নাই; বরং সে যা ঠিক ঠিক শুনেছে তাই মুখস্ত রেখেছে অত:পর সে যা, শুনেছে তাই বর্ণনা করেছে তার মধ্যে কোন কিছু যোগও করে নাই এবং তা থেকে কোন কিছু বাদও দেয় নাই। সে যদি কোন পরিবর্তিত হাদিস শুনতো তাহলে সে তা মনে রাখত এবং সে অনুযায়ী কাজ করত। আর যদি সে রদ করা হাদিস শ্রবণ করত তা হলে সেটা বর্জন করত। সে কোনটা বিশেষ এবং কোনটা সাধারণ তা বুঝত আর সে অনুযায়ী প্রত্যেকটার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতো। সে সহজ ও জটিল বিষয় সমূহ বুঝত! রাসূল (সা.)-এর বাণীসমূহ দুই ধরনের ছিল।

বৈশিষ্টপূর্ণ বাণী ও সাধারণ বাণী। সে সব বাণী এমন লোক শুনত যা সে বুঝত না যে এ দ্বারা আল্লাহ্ কি বোঝাতে চেয়েছেন, আর রাসূল (সা.) কি বোঝাতে চেয়েছেন। এমন অবস্থায় শ্রবণকারী উহা বহন করে এবং মুখস্ত করে তাঁর অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝা ছাড়াই অথবা এর প্রকৃত অভিপ্রায় না জেনে বা কি কারণে তা উচ্চারণ করেছিলেন তা না জেনে, রাসূল (সা.)-এর আসহাবগণের মধ্যে সকলেই তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন না, বুঝতে চাইতেন এবং এটাই পছন্দ করতেন যে, বেদুইন আরবদের মধ্যে কেউ বা কোন আগন্তক আসবে এবং তাঁকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন আর তারা শুনে নিবেন। আমার সম্মুখ দিয়ে তার এমন কোন বিষয় অতিক্রম করত না

আমি তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা ব্যতীত এবং উহা আমার স্মৃতিতে সংরক্ষন করা ব্যতীত এটাই হলো কারণ লোকেরা যার জন্য বিভিন্নতা করত বা তাঁদের বর্ণনায় বিকৃতি ঘটত।" [নাহজুল বালাঘা, খুতবা নাং-২০৮]

রাসূল (সা.)-এর ওফাতের পর এই সব মুনাফেকদের ভন্ডামীপূর্ণ কার্যকলাপ বৃদ্ধিলাভ করে এবং তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করত বিনা দ্বিধায়, আর যারা তা শুনত তাঁরা তা আল্লাহ্‌র রাসূলের বক্তব্য হিসাবে বিশ্বাস করত। পরবর্তীকালে সমস্ত সাহাবীই যে খাটি এই বিশ্বাস তাঁদের জিহ্বা বন্ধ করে দিত যার ফলে তাঁদের সম্পর্কে সমালোচনা করা, প্রশ্ন তোলা, আলোচনা করা এবং আপত্তি উত্থাপন করা থেকে অনেক উর্ধ্বে ধরা হত। তদুপরি তাঁদের দর্শনীয় কর্মকান্ড তাদেরকে সরকারের নজরেও প্রাধান্য দিয়েছিল যার জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে মনোবলের ও অসীম সাহসিকতার প্রয়োজন হত। হযরত আলীর (রা.) এই বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়। এই সব লোকেরা বিপথগামী নেতাদের কাছে এবং দোজখের পথের আহবানকারীদের পদমর্যাদার বন্দনা করেছিল মিথ্যা ও নিন্দার মাধ্যমে। সুতরাং তারা তাদেরকে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করেছিল এবং তাদেরকে লোকদের উপর কর্মকর্তা নিযুক্ত করেছিল। ইসলাম ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে মুনাফিকরা ধনসম্পদ কুক্ষিগত করার সংকল্প করত এবং তাঁরা নিজেদেরকে মুসলিম দাবী করে যথেচ্ছভাবে এ সব কুকর্ম করছিল যার জন্য তারা ইসলামের মুখোশ ফেলে দিতে চাচ্ছিলনা এবং তার ভিত্তিমূল ধ্বংসের কাজে নিজেদের কে নিয়োজিত করেছিল এবং বিভেদ এবং বিচ্ছিন্নতা বিস্তার করছিল মিথ্যা হাদিস রচনার মাধ্যমে এ প্রসঙ্গে ইবনে আবিল হাদীদ লিখেছেন-

যখন তাঁদেরকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হতো তারাও অনেক জিনিস বের করে দিত যখন লোকেরা তাঁদের সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করত তারাও ইসলাম সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করত কিন্তু তারা গোপনে মিথ্যা কাহিনী রচনার কাজ চালিয়ে যেত। যার দিকে হযরত আলী (রা.) ইঙ্গিত করেছেন। কারণ প্রচুর পরিমাণে, অসত্য জিনিস হাদিসের সঙ্গে মিশানো হয়েছে অযৌক্তিক বিশ্বাস পোষণকারী ও লোকদের দল দ্বারা যাদের উদ্দেশ্য ছিল বিপথগামী করা এবং রাসূল (সা.)-এর মতামতকে এবং ইসলামকে বিকৃত করা অপরদিকে তাদের কিছু লোক কোন বিশেষ দলের উচ্চ প্রশংসা করাতে মনোযোগী হত যে দলের সঙ্গে তাঁদের অন্য রকম পার্থিব স্বার্থ জড়িত ছিল। এই সময় পার হয়ে যাওয়ার পর যখন মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান ধর্মীয় নেতৃত্ব অধিকার করল ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে এবং পার্থিব কর্তৃত্বের সিংহাসন দখল করল সে সময় একটা স্থায়ী বিভাগ খুলে দিয়েছিল মিথ্যা হাদিস তৈরির জন্য এবং তাঁর কর্মচারীদিগকে রাসূল (সা.)-এর আহলে বাইতদের মর্যাদা হানিকর এবং উসমান (রা.) ও উমাইয়াদের প্রশংসাসূচক হাদিস জাল করতে এবং সেগুলো জন প্রিয় করাতে আদেশ প্রদান করেছিল। এবং এই কাজের জন্য পুরস্কার ও জমি মজুরী প্রদান করার কথা ঘোষণা করেছিল। ফলে স্বঘোষিত মর্যাদা দানকারী হাদিস অধিক সংখ্যায় হাদিসের পুস্তকগুলিতে প্রবেশ লাভ করতে লাগল। ইবনে আবিল হাদীদ উদ্ধৃতি করেছেন যে- মুয়াবিয়া তাঁর কর্মচারীদেরকে লিখেছিল যে, তারা যেন ঐ সব লোকের বিশেষ যত্ন নেয় যারা উসমানের সমর্থক, তার হিতাকাঙ্ক্ষী এবং তাঁর প্রেমিক এবং তাদেরকে যেন উচ্চ পদমর্যাদা, অগ্রাধিকার এবং সম্মান প্রদান করে আর যারা সুখ্যাতিপূর্ণ এবং সম্মানসূচক হাদিস বর্ণনা করে এবং যে কোন লোকের দ্বারা ঐ রকম যা কিছু বর্ণিত হয়ে থাকুক তা তার নাম, তার বাপের নাম, এবং প্রপুত্রের নামসহ তাকে অবগত করাতে আদেশ দিয়েছিলেন। তাঁরা তদনুসারেই কাজ করত এবং উসামনের (রা.) গুণ মর্যাদা সম্বলিত কাড়ী কাড়ী হাদিস জমা হয়ে গিয়েছিল কেবল মুয়াবিয়াই তাঁদেরকে পুরস্কার, কাপড় চোপড়, তৎকালীন দান এবং ভূসম্পত্তি প্রদান করত।

উসমান (রা.)-এর প্রশংসনীয় গুণকীর্তন করে যে সব জাল হাদিস তৈরি হয়েছিল সেগুলো যখন রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল তখন পূর্বেকার খলিফাগণের অবস্থান মর্যাদায় নীচে হওয়া উচিত নয়, এই অভিসন্ধিতে মুয়াবিয়া তাঁর কর্মচারীদের লিখেছিল- "যতশীঘ্র তোমরা আমার এই আদেশপ্রাপ্ত হও যে তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে লোকদেরকে সাহাবীদের সম্পর্কে এবং পূর্বের খলিফাদের সম্পর্কে ও হাদিস তৈয়ার করতে আহবান করো আর এই সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করা যে যদি কোন মুসলমান আবু তোরাব (হযরত আলী (রা.)) সম্পর্কে কোন হাদিস বয়ান করে। তোমাদের কর্তব্য হবে (অনুরূপ) একটি হাদিস সাহাবীদের সম্পর্কে তৈয়ার করা যেটা ঐ হাদিসের প্রতিবাদী হবে কারণ এটা আমাকে সবচেয়ে অধিক আনন্দ দেয় এবং আমার নয়ন ঠান্ডা করে আর এগুলি আবু তোরাবের এবং তাঁর দলভুক্তদের অবস্থান দুর্বল করে এবং তাঁদের নিকট এ গুলো উসমানের গুণাবলী

ও বৈশিষ্ট্যের চেয়েও অধিক কঠোর।" যখন তাঁর চিঠি গুলো লোকদের পড়ে শুনানো হয়েছিল রকমারি ও বিপুল সংখ্যক হাদিস সাহাবীদের প্রশংসায় বর্ণনা করা হয়েছিল যেগুলি সবই জাল এবং সত্যের লেশহীন। [শারহে ইবনে আবিল হাদীদ, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৬] এই প্রেক্ষাপটে আমরা কয়েকজন সাহাবার মর্যাদা সংক্রান্ত হাদিস পর্যালোচনা করবো। হযরত ইমাম মালেক রেওয়ায়েত করেন রাসূল (সা.) ওহুদের শহীদের ব্যাপারে বললেন আমরা কি তাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছি। তখন আবু বকর বললেন আমরা কি তাঁদের ভাই নই? তাঁরা যে ভাবে মুসলমান হয়েছিল আমরাও কি সে ভাবে মুসলমান হই নাই? আমরাও কি তাঁদের মতন জিহাদ করি নাই? যেভাবে তারা করেছে। তখন রাসূল (সা.) বললেন:- হা তা তো ঠিক, কিন্তু আমি জানিনা আমার মৃত্যুর পর তোমরা কি কি বিদাত সৃষ্টি করবে। এরপর আবু বকর কাঁদেন, খুব কাঁদেন এবং কহিলেন আমরা আপনার পর অবশিষ্ট থাকব [মুআত্তা, প্রথম খণ্ড, ৩০৭ পৃষ্ঠা]।

বোখারী লিখেছেন- একদা ওমর বিন খাত্তাব, হাফসার (রা.) (উম্মলু মুমেনিন) কাছে আসলেন, হাফসার কাছে আসমা বিনতে উমাইশও ছিলেন। ওমর আসমাকে দেখে বললেন এই কি সেই ইথিয়োপিয়াবাসী, আসমা বললেন জ্বী হ্যাঁ, তখন ওমর বললেন, আমাদের (ওমর এর মক্কা থেকে মদীনায় গমনের হিজরত) হিজরত তোমাদের পূর্বে তাই রাসূলের (সা.)-এর ব্যাপারে আমরা তোমাদের চেয়ে বেশী হকদার (আমাদের মর্যাদা তোমাদের চেয়ে রাসূলের কাছে বেশী)। এ কথায় আসমার রাগ হলো তিনি বললেন কখনই না খোদার কসম এ হতে পারে না। তোমরা রাসূল (সা.)-এর সাথে ছিলে, তিনি তোমাদের ভুখাদের খাবার খাইয়েছেন। অজ্ঞদের ওয়াজ করে শিখিয়েছেন। আর আমরা এমন স্থানে ছিলাম যা বিদেশ ও দুশমনদের জায়গায়। হাবশায় আমরা যা যা করেছি তা শুধু আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সা.)-এর জন্যই। খোদার কসম আমরা যখনই যা পেয়েছি, খেয়েছি বা পান করেছি তখন রাসূলের (সা.) স্মরণ অবশ্যই করতাম। আমাদেরকেও কষ্ট দেয়া হতো। আমরা সর্বদাই ভীত সন্ত্রস্ত থাকতাম। তাই আমাদের মত তোমরা কি করে হতে পার? আমি এই ঘটনা রাসূল (সা.)-এর কাছে বলবো খোদার কসম। না মিথ্যে বলব, না বাড়িয়ে বলব না, কমিয়ে বলব। অত:পর রাসূল (সা.) যখন আসলেন তখন আসমা হুজুর (সা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন হে রাসূল (সা.) ওমর এই কথা বলেছে। তখন হুজুর (সা.) বললেন তুমি কি বলেছ? আসমা বললেন আমি এই বলেছি। রাসূল (সা.) বললেন, তোমাদের চেয়ে সে বেশী হকদার নয় সে এবং তার সাথীরা এক হিযরত করেছে আর তোমরা হেজাজের লোকেরা দুই হিজরত করেছ। আসমা (রা.) বর্ণনা করেন (এই ঘটনার পর) আবু মুসা ও হেজাজের অন্যান্য লোকজন সব সময় আমার কাছে আসতেন এবং এই হাদিসের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতেন। দুনিয়ার এমন কোন জিনিস নেই যে তাঁদের অন্তরকে এই হাদিসের চেয়ে বেশী খুশী করতে পেরেছে। আর এই হাদিসের চেয়ে চেয়ে গুরুত্ব ও তাদের কাছে পৃথিবীর আর কিছু নেই। [সহীহ্ বোখারী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩৮৭]

এখন আমরা হাদিস দুটি বিশ্লেষণ করবো। মোয়াত্তায় বর্নিত আবু বকর (রা.) সম্পর্কিত হাদিসের মাধ্যমে জানা যায় যে, রাসূলে খোদা (সা.) নিজে আবু বকর (রা.)-কে সন্দেহ করতেন এবং সাক্ষ্য দেননি। কারণ রাসূল (সা.) বলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর তারা কি করবে তা তিনি জানেন না। এবং বোখারী শরীফের হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী স্বয়ং রাসূল (দ.) আসমার (রা) উপর ওমর (রা.) ফজিলত ও গ্রহণ করেননি; বরং আসমাকে ওমরের উপর ফজিলত দিয়েছেন। তাহলে আমাদেরও সত্য না জানা পর্যন্ত সন্দেহ করার অধিকার রয়েছে। সুতরাং এই হাদিসগুলো স্পষ্টত আবু বকর (রা.) ও ওমর (রা.)-এর মর্যাদা ও ফজিলতের স্বপক্ষে এ পর্যন্ত জানা গেছে বা বলা হয়েছে যা কিছু তার অসারতা ও ভিত্তিহীনতা হাদিসেই প্রমাণিত হয়। কারণ রাসূল (সা.) আবু বকর (রা.) এর বিশেষ মর্যাদার সাক্ষ্য দেন নি কারণ তিনি জানেন না যে তার ইন্তেকালের পর তারা কি কি করবে? এটা কোরআন থেকে প্রমাণিত ইতিহাস সাক্ষী! তারা রাসূল (সা.)-এর পর অনেক পরিবর্তন করেছে। এ জন্যই আবু বকর কেঁদেছেন কারণ তিনি পরিবর্তন করেছেন। ফাতেমা (আ.)-কে রাগান্বিত করেছিলেন। এসব কারণে তিনি মৃত্যুর আগে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে ছিলেন এবং আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন তিনি মানুষ না হয়ে যদি অন্য কিছু হতেন। এখন রয়ে গেল ঐ হাদিস যে হাদিসে বলা হয়েছে সমস্ত উম্মতের ঈমানের চেয়েও আবু বকরের ঈমানের পাল্লা ভারী হবে। অথবা রাসূলের (সা.)-এর পর উম্মতের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ। এ ধরনের হাদিস অবশ্যই বাতিল এবং কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। যুক্তি ও বাস্তবতা তা গ্রহণ করতে পারে না। যে ব্যক্তি চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত মোশরেক ছিলেন, দেব দেবীর পূজা করতেন, তাঁর ঈমান গোটা মুসলমানের ঈমানের চেয়েও

বেশী তা কোন অবস্থাতেই হতে পারেনা, কেননা উম্মতে মোহাম্মদ (সা.)-এর মধ্যে মহান ইমামগণ, ওলী আল্লাহ্, শহীদ রয়েছেন যাঁরা গোটা জীবন আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করেছেন। তাই আবু বকর (রা.)-এর জন্যে এই হাদিস কি করে যৌক্তিক ও ন্যায় ভিত্তিক হতে পারে? যদি তিনি রাসূল (সা.)-এর কাছ থেকে এ ধরনের সনদ পেয়েই থাকতেন তাহলে শেষ জীবনে নিজে মানুষ হওয়ার প্রতি অনীহা প্রকাশ করলেন কেন? তার ঈমান যদি বেশী হবে তাহলে বেহেশতের সম্রাজ্ঞী ফাতেমা (আ.) তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হতেন না এবং প্রত্যেক নামাজের পর তাঁর জন্য অভিসম্পাত ও বদদোয়া করতেন না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্র নির্দেশ যদি তোমারা সত্যবাদী হয়ে থাক তবে নিজের দলিল উপস্থাপন কর।

সপ্তম অধ্যায়
রাসূল (সা.)-এর ওফাত, গোসল ও জানাজা

উম্মুল মোমিনিন আয়েশা (রা.) হতে বর্ণনা করা হয়েছে- যখন রাসূল (সা.)-এর ওফাতের সময় উপস্থিত হলো (তিনি) রাসূল (সা.) ফরমাইলেন আমার মাহবুবকে আমার কাছে ডেকে দাও। আয়েশা (রা.) ফরমাইতেছেন আমি আবু বকরকে (রা.) ডাকিয়া দিলাম। রাসূল (সা.) পুনরায় নির্দেশ দিলেন আমার প্রিয়কে আমার কাছে। ডেকে দাও। ওমর (রা.) কে ডাকা হলো। ওমর (রা.) আসতেই রাসূল (সা.) আবার আদেশ করলেন আমার মাহবুবকে ডেকে দাও। হযরত আলীকে (আ.) ডেকে আন। যখন আলী (আ.)-কে রাসূল (সা.) দর্শন করলেন তিনি চাদর মোবারক যা দ্বারা নিজেকে আবৃত করে রেখেছিলেন তা উঠিয়ে উহার মধ্যে হযরত আলীকে ডাকিয়া লইলেন এবং নিজ পবিত্র বক্ষদেশের সংগে আলিঙ্গনাবদ্ধ রাখলেন। যতক্ষণ না তাঁর রুহ্ মোবারক মহাপ্রস্থান করলেন।

ইমাম নেসাই (র.) হযরত সালমা (রা.) হতে বর্ণনা করেন- ঐ পাক জাতের কসম করে সালমা (রা.) বলেন- নিঃসন্দেহে রাসূল (সা.)-এর বেসাল হকের সময় সবচেয়ে নিকটে ছিলেন হযরত আলী (আ.)। তিনি আরো বলেন, আমার মনে হয় হযরত (সা.) স্বয়ং কোন কাজে আলী (আ.)-কে বাইরে পাঠিয়েছিলেন। সূর্যোদয়ের পূর্বে হযরত আলী (আ.) উপস্থিত হলেন। আমি বুঝলাম এই মহা সময়ে রাসূল (সা.) তাঁর সাথে জরুরী কথা বলবেন। এ জন্য আমি ঘর হতে বের হয়ে গেলাম এবং দেখলাম হযরত মুহাম্মদ (সা.) হযরত আলী (আ.)-এর মুখে মুখ লাগাইয়া উভয়ে সিনায় সিনা চুপি চুপি কিছু গোপন কথা ফরমাইতেছেন। খোসায়েস, পৃষ্ঠা-২৮]

এই দুটি হাদিস থেকে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (সা.) তাঁর ওফাতের পূর্ব মুহূর্তে ঐশী নির্দেশে রূহানী ও বাতেনী উত্তরাধিকার হযরত আলী এর নিকট আমানত রাখেন এবং তার মাধ্যমে এই মহাসম্মানিত মহাজ্ঞান কিয়ামত পর্যন্ত লোক পরম্পরায় এক হতে অন্য দ্বারা জারী থাকবে। ৬৩ বছর বয়সে মহানবী (সা.) ৬৩২ খৃষ্টাব্দের ৮ জুন সোমবার পরলোকগমন করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। নিশ্চয়ই সমস্ত কিছু আল্লাহ্র জন্য এবং সমস্ত কিছু তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত। [এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পড়ুন- আলে রাসূল। পাবলিকেশন্স-এর বই "ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর শাহাদাত লেখক -নূরে আলম মুহাম্মাদী]

রাসূল (সা.)-এর গোসল ও রওজা

রাসূল (সা.) ওসীয়ত (সা.) করেছিলেন তাঁর (সা.) ওফাতের পর আলী (আ.) ছাড়া অন্য কেহ যেন তাঁর পবিত্র গোসল মোবারক না দেয় বা খালি চোখে তার পবিত্র দেহ মোবারক দর্শন না করে। এই নির্দেশ অমান্যকারী অন্ধ হয়ে যাবে। এই নির্দেশের প্রেক্ষিতে আলী (আ.) রাসূল (সা.)-এর গোসল সম্পন্ন করেন এবং ফজল বিন আব্বাস (রা.), ওসামা (রা.) চোখে কাপড় বেঁধে হযরত আলীকে সহায়তা করেন। এ প্রসঙ্গে হযরত আলী (আ.) স্বয়ং বর্ণনা করেন:- যখন রাসূল (সা.) ইন্তেকাল করলেন তাঁর মাথা ছিল আমার বুকের উপর তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পড়েছিল আমার তালুতে যখন আমি তা আমার মুখের উপর প্রবাহিত করেছিলাম। আমি তাঁর (আল্লাহ্ ও তাঁর উপর এবং তাঁর বংশাবলীর উপর শান্তি বর্ষণ করন)-শেষ গোসল করিয়েছিলাম যখন ফেরেস্তাগণ আমাকে সাহায্য করেছিল। গৃহটি এবং আঙ্গিনা ক্রন্দনরত হয়েছিল। ফেরেস্তাগণ নামছিল আর ফেরেস্তাগণ উপরে উঠছিল,

আমার কানকে তার উপর তাঁদের প্রার্থনার সুমধুর ধ্বনি শ্রবণ করা থেকে বিরত করতে পারছিলাম না যে পর্যন্ত আমরা তাকে কবরস্থ না করেছিলাম। অতঃএব তাঁর জীবিতাবস্থায় এবং ইন্তেকালের পর কে আমার চেয়ে তাঁর উপর অধিক সত্যবান। [নাহজুল বালাঘা, ভাষণ নং- ১৯৫; মূল: মাওলা হযরত আলী (আ.)। বাংলা অনুবাদ বজলুর রহমান জুলকারণাইন ওরফে জালাল উদ্দিন উয়াইছী ২য় মুদ্রণ ১লা সফর ১৪৩৩] ৪ হযরত আলী (আ.)-শোকে বিহবল। মহামানবের মৃত্যু শয্যায় তাঁর দেহ মোবারক আঁকড়ে আছেন। ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সাহাবা ও আপন আত্মীয় ছাড়া আর কেউ আশে পাশে নেই। ঐভাবে দিন ও দিবাগত রাত্রি অতিবাহিত হল পরদিন মঙ্গলবার রাসূল (সা.) কে কাফন পরানো হলো এই অবস্থায় পরদিন বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর অল্প কয়েকজন সাহাবার উপস্থিতিতে হযরত আলী (আ.)-এর ইমামতিতে জানাজার নামাজ সম্পন্ন হলো। হযরত আলী (আ.) নিজে রাসূল (সা.)-এর পবিত্র দেহ মোবারক কবরস্থ করা হয়। অত:পর হযরত আলী (আ.) ক্রন্দনরত অবস্থায় মুনাজাত করলেন: হে আল্লাহ্ এই লোকটি ছিল আপনার প্রথম সৃষ্টি। তাঁর প্রকাশ্য ইন্তেকাল মরণ নয়, সৃষ্টির পূর্বে তমসা ঘুচায়েছেন। তিনি আপনার যশ, মহিমা ও হিতেচ্ছার প্রমাণ। তিনি আপনার প্রভাত উজ্জ্বল জগত নিয়ে আমাদের কাছে এসেছিলেন সেই জগতের দিকে হেদায়েত করতে। তাঁর আত্মা আপনার মহাশক্তির প্রতিচ্ছবি এবং আপনার সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং তাঁর দিল ছিল আপনার ভান্ডার। অতঃপর উপরে উঠে কবর মাটি দ্বারা ঢেকে দিলেন। [হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.), মোহাম্মদ মুহসিন, পৃষ্ঠা-১৯৫]।

রাসূলে করীম (সা.)-এর দাফন কাজ শেষ হওয়ার পর আবু বকর (রা.), ওমর (রা.) সহ অন্যান্যরা জানাজার নামাজ আদায়ের জন্য হযরত রাসূল (সা.)-এর লাশ মোবারক কবর থেকে উঠানোর উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। এতে রাসূল (সা.)-এর মর্যাদার প্রতি অবমাননা হবে। এ কাজ কিছুতেই করা সমীচীন নয় মর্মে প্রবল বাধা সৃষ্টি করেন হযরত আলী (আ.), তিনি কবরের দুপাশে দু পা রেখে খোলা জুলফিকার (তরবারী) হাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। অবশেষে সমঝোতার ভিত্তিতে হযরত আলীর (আ.) পরামর্শ অনুযায়ী মাজার শরীফকে সামনে রেখে জানাজার নামাজ আদায় করা হল। কথা ছিল হযরত রাসূল (সা.)-এর মৃত্যুর পর মাটির ঘোড়ায় সওয়ার কোন ব্যক্তির সামনে গেলে তাঁর ধ্বংস অনিবার্য। হযরত আলীর (আ.) কবরের দুপাশে পা রেখে দাঁড়ানো মানে মাটির ঘোড়ায় সওয়ার হওয়া এ বিষয়টি মনে হওয়ায় আর কেউ হযরত আলীর (আ:) এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন নি।

রাসূল (সা.)-এর ওফাতের প্রতিক্রিয়া ও বনি সকিফায় খলিফা নির্বাচন পর্যালোচনা

হযরত ওমর (রা.) ও মুগীরাহ বিন সুবাহ অনুমতি নিয়ে রাসূল (সা.)-এর হুজরায় প্রবেশ করলেন এবং যে কাপড় দিয়ে তার চেহারা ঢেকে দেয়া হয়েছিলো তা সরিয়ে ফেললেন। রাসূল (সা.)-এর চেহারা দেখার পর চীৎকার করে বলে উঠলেন দেখো রাসূল্লাহ (সা.)-কেমন মারাত্মকভাবে বেহুঁশ হয়ে গেছেন। তিনি একথা বলে হুজরাহ থেকে বিদায় নিয়েছেন। তখন ওমর (রা.) বললেন তুমি মিথ্যা বলেছে, রাসূল (সা.) কখনো মারা যান নি। কিন্তু তুমি যেহেতু বিশৃঙ্খলাকারী লোক সেহেতু এরূপ ভাণ করেছে। রাসূল (সা.) মুনাফিকদের ধ্বংস না করা পর্যন্ত কখনো মারা যাবেন না।

অতঃপর ওমর বলেন, যে ব্যক্তি বলবে যে, রাসূল (সা.) মারা গেছেন এই তলোয়ার দ্বারা আমি তার মাথা ধড় থেকে আলাদা করে ফেলব। এ পর্যায়ে হযরত আবু বকর ঘটনাস্থলে পৌঁছলেন ওমর (রা.) আবু বকর (রা.)-কে দেখে শান্ত হয়ে গেলেন। হযরত আবু বকর (রা.) আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন এবং বললেন, যাঁরা আল্লাহ্র ইবাদত করে তারা জেনে রাখুক যে, আল্লাহ্ চিরঞ্জীব ।

আর যাঁরা মুহাম্মদের ইবাদত করে তারা জেনে রাখুক যে মুহাম্মদ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। এরপর তিনি সূরা আল-ইমরানের ১৩৩ নম্বর আয়াত পাঠ করলেন-

"আর মুহাম্মদ আল্লাহ্র রাসূল ছাড়া আর কিছুই নয়, তার পূর্বে রাসূলগণ চলে গেছেন, অতএব তিনি যদি মৃত্যু বরন করেন বা নিহত হন তাহলে কি তোমরা তোমাদের অতীত অবস্থায় ফিরে যাবে? তাহলে তারা আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ্ অচিরেই কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন।"

হযরত ওমর (রা.) জিজ্ঞাস করলেন আপনি যা পড়লেন তা কি কোরআনের আয়াত। আবু বকর (রা.) বললেন হ্যাঁ। এখন আমাদের বিবেচ্য বিষয় হলো এই দুই শায়খের বক্তব্য ও তাঁর পর্যালোচনা বা বিশ্লেষণ। ইতিহাস

সাক্ষী যে, তাঁদের বক্তব্য ও মন্তব্য ইসলামের ইতিহাসে যে বিভিন্ন ধর্মীয়, মত, পথ, বা বিরোধিতা রয়েছে তা এই দু'টি বক্তব্যের সাথে সম্পর্কিত। আমরা জানি ধর্ম হিসাবে ইসলাম অত্যন্ত মানবতাবাদী, ন্যায়পরায়নতা, সত্যবাদিতা, ও যুক্তি ভিত্তিক ধর্ম। এই প্রেক্ষাপটে কোন ধরনের অপরাধের জন্য কি শাস্তি তা আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন এবং তা মানা বা প্রতিপালন করা মুসলমানদের জন্য ফরজ হিসাবে ঘোষণা করেছেন এবং তা প্রতিপালন না করা তথা অস্বীকার একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আমরা জানি পবিত্র কোরআনে কোন অপরাধে কাউকে মৃত্যুদণ্ড শাস্তি দেয়া যেতে পারে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই কারণে আমি বনি ইসরাইলের প্রতি এই বিধান দিলাম যে-

"নরহত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করা হেতু ব্যতীত কেহ কাহাকেও হত্যা করিল, সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করল, আর কেহ কাহারও প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করিল।" [সূরা ০৫ মায়েদা, আয়াত-৩২]।

নরহত্যা বিষয়ক এই বিধান মুসলমানদের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। এরই ধারাবাহিকতায় আল্লাহ্তায়ালা আরো ঘোষণা করেছেন-

"আমি তাহাদের জন্য উহাতে বিধান দিয়াছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম। অত:পর কেহ উহ ক্ষমা করলে উহাতে তাহারই পাপ মোচন হইবে। আল্লাহ্তায়ালা যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন। তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না তাহারাই জালিম।" [সূরা ০৫ মায়েদা, আয়াত-৪৫]

আল্লাহ্তায়ালার এ রকম সুস্পষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও ওমর (রা.) কিভাবে শুধুমাত্র একটি সত্য কথা প্রকাশ করার অপরাধে কাউকে মৃত্যুদন্ডের শাস্তি দিতে পারেন বা দেওয়ার কথা ঘোষণা করতে পারেন। তাই আমাদের বিবেচ্য। শুধু তাই নয় এবং পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাই যে, আবু বকর (রা.)-এর খেলাফত অস্বীকারকারীকেও তিনি মৃত্যু শাস্তি দিতে যাচ্ছিলেন বা ক্ষেত্র বিশেষে দিয়েছেনও। উপরন্তু হযরত ওমরের (রা.) খলিফা নির্ধারণী কমিটি তিন দিনের মধ্যে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়নে ব্যর্থ হলেও তিনি সবাইকে মৃত্যুদণ্ড শাস্তি দেয়া হবে বলে বলেন অথবা এমন ধরনের মত পোষণকারীরও মৃত্যুদণ্ড শাস্তি দেয়া হবে মর্মে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করেন। পরবর্তীতে ওমর (রা.)-এর এই নির্দেশ মুসলমান রাজা-বাদশাহগণ এত ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন যে, এ কারণে ইসলামে মত প্রকাশের স্বাধীনতা যা আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.) কর্তৃক স্বীকৃত ও প্রদত্ত অথচ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলে এই কোরআন বিরোধী নির্দেশ কার্যকর করা হয়। যে ধারা এখন পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। ইসলামের রাজনৈতিক ইতিহাস - এত দুঃখজনক ও কলঙ্কজনক হওয়ার এটা একটি অন্যতম কারণ। হযরত আবু বকর (রা.) পবিত্র কোরআনের যে আয়াত পাঠ করেছিলেন তা তিনি প্রথম শুনলেন বলে প্রতীয়মান। এতে পবিত্র কোরআন সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট হয়ে যায়। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন- "যারা মুহাম্মদের ইবাদত করে এটি মুসলমানদের বিরুদ্ধে একটি ভয়াবহ অপবাদ, তিনি স্বয়ং কি আল্লাহ্র ইবাদতের অংশ হিসাবে রাসুল (সা.)-এর আদেশ-নিষেধ মেনে চলতেন অথবা আল্লাহ্র প্রেমের গভীর অংশ হিসেবে রাসূল (সা.)-এর প্রতি ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়েই তাঁর ধন-সম্পদ দান করেছিলেন তাহলে রাসূলের নির্দেশ প্রতিপালন করা বা রাসূল (সা.)-কে ভালবাসার অর্থ কি । রাসূলের ইবাদত করা? অথচ আল্লাহ্তায়ালা স্বয়ং পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন-

"বল তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর। আল্লাহ্ ও তোমাদিগকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম, দয়ালু।" [সূরা ০৩ আলে ইমরান, আয়াত-৩১]

"রাসূল এই উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করিয়াছি যে, আল্লাহ্র নির্দেশ অনুসারে তাহার আনুগত্য (ভালোবাসা) করা হইবে। যখন তাহারা নিজেদের প্রতি জুলুম করে তখন তাহারা তোমার নিকট আসিলে ও আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে এবং রাসূল ও তাহাদের জন্য ক্ষমা চাহিলে তাহারা অবশ্যই আল্লাহ্কে পরম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালুরূপে পাইবে।" [সূরা ০৪ নিসা, আয়াত-৬৪]

অনুরূপভাবে আল্লাহ্র সাথে রাসূলের পার্থক্য বা তাঁরতম্য সম্পর্কে পবিত্র কোরআন-

“যাহারা আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে এবং তাহার রাসূলদিগকেও এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রাসূলের মধ্যে ঈমানের ব্যাপারে তারতম্য করিতে চাহে এবং বলে আমরা কতককে বিশ্বাস করি ও কতককে অবিশ্বাস করি আর তাহারা মধ্যবর্তী পথে অবলম্বন করিতে চাহে। ইহারাই প্রকৃত কাফির এবং কাফিরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত আছে। যাহারা আল্লাহ্‌ ও তাহার রাসূলগণের উপর ঈমান আনে এবং তাহাদের একের সহিত অপরের পার্থক্য করে না। উহাদিগকে তিনি অবশ্যই পুরস্কার দিবেন এবং আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।” [সূরা ০৪ নিসা, আয়াত ১৫০-১৫২]

উল্লেখ্য আবু বকরের (রা.) অবশ্যই পবিত্র কোরআনের এ সমস্ত আয়াতের বক্তব্য বিষয়ে জানা ছিল অথচ তিনি রাসূল (সা.)-এর ভালোবাসাকে ইবাদত হিসাবে উল্লেখ করে একটি ভয়াবহ ফিতনা সৃষ্টি করলেন। এই ফিতনার ধারাবাহিকতায় এক ধরনের বুদ্ধিজীবী রাসূল (সা.)-এর প্রতি মুহাব্বত, তাঁর মাজার জিয়ারত, তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করা তথা সঠিকভাবে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী রাসূল (সা.)-এর যথাযথ মর্যাদা দান করাকেই শিরক বেদাত প্রভৃতি আখ্যায়িত করে মুসলমান উম্মাহর মধ্যে অনাবশ্যকভাবে বিভিন্ন ফিরকা সৃষ্টির সুযোগ তৈরি করেছে।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সুফিবাদী লেখক ও কোরআন গবেষক ডা. এ এন এম এ মোমিন বিরচিত “আহলে বাইত-এ-রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম এবং সাহাবা” একটি পর্যালোচনা নামক বইটি আমি অত্যন্ত মনোযোগসহকারে পড়েছি। বইটি সাহাবীদের শ্রেণি বিভাগের মাধ্যমে সত্যিকারের রাসূল প্রেমিক সাহাবা চেনার বিষয়ে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা রাখবে। তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে যেভাবে একনিষ্ঠ সাহাবা দোদুল্যমান সাহাবা এবং মোনাফেক সাহাবা চিহ্নিত করা হয়েছে তা অতীব যথার্থ। এখানে সূরা মোনাফেক নাজিলের যথার্থ চমৎকারভাবে প্রতিফলন ঘটেছে। প্রকৃত পক্ষে ইসলামের মূল ধারা রাসূল পরিবার বা রাসূলের বংশধারা বা আহরে বায়াত তা যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে আওলাদে রাসূল চেনা এবং আওলাদে রাসূলের পথ অনুসরণ করাই হচ্ছে ইসলামের মূল ধারা। হুজুরপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত পরবর্তী রাষরাষ্ট্র ক্ষমতা নিয়ে সাহাবাদের কার্যক্রম এবং রাসূল পরিবারের সদস্যদের সাথে নির্দয় ব্যবহার সর্বোপরি উমায়া, আরববাসীয় ইয়াজিদ মোয়াবিয়া দ্বারা ইসলামের মূলধারা থেকে বিচ্যুতি এবং নিজস্ব মতামত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের মতভেদ সৃষ্টির সূচনা বা অদ্যাবিধি বলবৎ আছে তা চমৎকারভাবে উপস্থাপন হয়েছে। বইটি ঈমাণী পরক্ষির জন্য সর্বকালের সেরা সিলেবাস, যা অনুসরণ কররে ইসলামের বন্ধু এবং শত্রু খুব সহজে চিহ্নিত করা যাবে। আমি লেখকের সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি এবং যে উদ্দেশ্যে বইটি রচনা করেছেন, মহান আল্লহ্‌র তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায় হোন সে কামনা করছি আমিন!

গাজী মুহাম্মদ আনিসুর রহমান, পরিচালক, ন্যাশনাল গ্রামার স্কুল হালিশহর, চট্টগ্রাম।